সবাই গেছে বনে

হুমায়ূন আহমেদ

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

১. আকাশের দিকে তাকালে........ 3
২. ফার্গো খুবই ছোট শহর........ 15
৩. আনিসের ঘুম ভাঙল........ 23
৪. ফাইভ হানড্রেড লেভেলের একটি ক্লাস........ 36
৫. শফিকের কাণ্ডকারখানা........ 41
৬. টুকটুক করে টোকা পড়ছে........ 48
৭. ছ ফুট লম্বা টম........ 61
৮. ক্লাস থেকে বেরুনমাত্র........ 64
৯. রুনকি এণ্ড টম........ 70
১০. অক্টোবর মাস........ 77
১১. প্রচণ্ড শীত পড়েছে........ 85
১২. নিশানাথ বাবু........ 96
১৩. মন ভেজানর সব চেষ্টা........ 101

১৪. আমিন সাহেব শোভেল নিয়ে বেরুলেন 108
১৫. মালিশা গিলবার্ট 117
১৬. মেমোরিয়াল লাউঞ্জ 122
১৭. জং বাহাদুর 127
১৮. মিস মালিশা 131
১৯. কী ভয়ংকর সুন্দর 136
২০. সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক 138

১. আকাশের দিকে তাকালে

আকাশের দিকে তাকালে মন খারাপ হয়ে যায়।

অবিকল দেশের মতো মেঘ করেছে। চারদিক অন্ধকার করে একটু পরেই যেন কালবৈশাখীর তাণ্ডব শুরু হবে। আনিস কফি খেতে যাচ্ছিল। আকাশ দেখে তার খানিকটা মন খারাপ হয়ে গেল। বড্ড নষ্টালজিক মেঘ।

এ্যাণ্ডারসন ব্যস্ত ভঙ্গিতে পার্কিং লটের দিকে এগোচ্ছিল। আনিসকে দেখে থমকে দাঁড়াল, সরু গলায় বলল, এখনো বাড়ি যাও নি? প্রচণ্ড থাণ্ডারস্টর্ম হবে। ওয়েদার সার্ভিস স্পেশাল বুলেটিন দিচ্ছে।

কফি খেয়েই রওনা হব।

লিফট চাও? লিফট দিতে পারি।

না, লিফট চাই না।

এ অঞ্চলে ঝড় বৃষ্টি বড়ো একটা হয় না। সে জন্যেই সম্ভবত লোকজনদের ভয় একটু বেশি। দেখতে দেখতে ক্যাম্পাস ফাঁকা হতে শুরু করেছে। কফি হাউসে মোটেই ভিড় নেই। উইক-এণ্ডে এ-রকম থাকে না কখনো! মেয়েরা সেজোগুজে বসে থাকে। ছেলেরা আসে ডেটের কথা পাকাপাকি করতে।

আনিস কফির পেয়ালা নিয়ে বা দিকে এগিয়ে গেল। কফি হাউসের শেষ মাথায় চার-পাঁচটি ছোট-ছোট ঘর আছে। তিন নম্বর ঘরটি আনিসের খুব প্রিয়। দারুণ ভিড়ের সময়ও সেটি ফাঁকা থাকে। আজ পুরো কফি হাউস ফাঁকা, কিন্তু সেখানে এক জন বুড়ি বসে আছে।

আমি কি এখানে বসতে পারি?

বুড়ি সম্ভবত ঘুমুচ্ছিল। আনিসের কথায় নড়েচড়ে বসল।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

বসার পরই আনিসের মনে হল কাজটি ভাল হয় নি। আমেরিকান বুড়িগুলো কথা না বলে থাকতে পারে না। ভ্যাজর ভ্যাজার করে দশ মিনিটের মধ্যে মাথা ধরিয়ে দেয়।

তুমি ইণ্ডিয়ান নিশ্চয়ই।

না, আমি ইণ্ডিয়ান নই।

তুমি কি মালয়েশীয়ান?

না, আমি বাংলাদেশী।

সেটি কোথায়?

ইণ্ডিয়া ও বার্মার মাঝামাঝি একটা ছোট দেশ।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

কত ছোট?

বেশ ছোট। নর্থ ডাকোটার অর্ধেক হবে।

বুড়ি খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগল আনিসকে। দাম ফুরিয়ে গেছে নিশ্চয়ই। বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু করবে।

তুমি কি শুনেছি, সিভিয়ার থাণ্ডারস্টর্ম হবে। স্পেশাল বুলেটিন দিচ্ছে দুপুর থেকে।

হাঁ শুনেছি। খুবই খারাপ ওয়েদার।

তুমি কি এই ইউনিভার্সিটির ছাত্র?

না, আমি এখানকার এক জন টীচার।

কোন সাবজেক্ট?

কেমিস্ট্রি। পলিমার কেমিস্ট্রি।

আনিস বড়োই বিরক্তি বোধ করতে লাগল। বুড়িগুলির কৌতূহল সীমাহীন। এরা মানুষদের বড্ড বিরক্ত করতে পারে। বুড়িটি তার ব্যাগ থেকে সিগারেট বের করল। লাইটার জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, তুমি কি এমিলি জোহানের নাম শুনেছ?

না। কে সে?

এখানকার এক জন বড়ো কবি। গত বৎসর রাইটার্স গিল্ড এওয়ার্ড পেয়েছে।

না, আমি তার নাম শুনি নি। লিটারেচারে আমার তেমন উৎসাহ নেই।

বুড়ি সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে তার হাত বাড়িয়ে দিল।

আমি এমিলি জোহান। তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম।

আনিস হকচকিয়ে গেল। বুড়ি থেমে থেমে বলল, সমস্ত কফি হাউস ফাঁকা, আর তুমি বেছে বেছে আমার এখানে বসতে এসেছ দেখে ভাবলাম হয়তো আমাকে চেন, গল্প করতে চাও। বুড়িদের সঙ্গে ইচ্ছে করে কে আর বসতে চায় বল?

আনিস ঠিক কী বলবে ভেবে পেল না। কিছু একটা বলা উচিত।

তুমি কিন্তু তোমার নাম বল নি এখনো।

আমার নাম আনিস সাবেত। তোমার মতো বড়ো কবির সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগল।

বুড়ি গলার স্বর নামিয়ে ফেলল। প্রায় ফিসফিস করে বলল, মোটেই বড়ো কবি নই। রাইটার্স গিল্ড এওয়ার্ড হচ্ছে একটা সস্তা ধরনের পুরস্কার। এখন পর্যন্ত কোনো বড়ো কবি রাইটার্স গিল্ড এওয়ার্ড পায় নি। আমি যখন পেলাম তখন এত মন খারাপ হল যে বলার নয়। বুঝতে পারলাম যে আমি এক জন সস্তা ধরনের কবি, থার্ড রেট।

বুড়ি উঠে দাঁড়াল। শান্ত স্বরে বলল, তোমার সঙ্গে কি আমার আবার দেখা হবে?

আনিসের উত্তর দেবার আগেই সে থেমে থেমে বলল,

ওয়ান ফ্লিউ টু দা ইস্ট
ওয়ান ফ্লিউ টু দা ওয়েস্ট।
এ্যাণ্ড ওয়ান ফ্লিউ ওভার দা কাক্কুস নেস্ট!

আনিস অনেকক্ষণ বসে রইল একা একা! এখান থেকে বাইরের আকাশ দেখা যাচ্ছে না, তবে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে তা চোখে পড়ে। কত তফাৎ! ঝমোঝম শব্দ নেই, গাছের পাতার শনশনানি নেই, ব্যাঙ ডাকছে না। বোঝার কোনোই উপায় নেই যে বাইরে আকাশ অন্ধকার করে ঝড়ো হাওয়া বইছে।

এ্যাটেনশন প্লীজ এ্যাটেনশন প্লীজ। কফি হাউস দশ মিনিটের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। এ্যাটেনশন প্লীজ।

কফি হাউস থেকে বেরিয়ে মনে হল বড্ড বোকামি হয়েছে। অনেক আগেই বাড়ি ফেরা উচিত ছিল। ভালো ঝড় হচ্ছে। লোকজন কোথায়ও নেই। পার্কিং লাট ধু ধু করছে। আনিস মেমোরিয়াল লাউঞ্জে চলে গেল। মেমোরিয়াল লাউঞ্জে পত্রিকা পড়ার ব্যবস্থা আছে। একটি প্রকাণ্ড ভিক্টোরিয়ান পিয়ানো আছে। হট চকলেট এবং পেপসির দুটি ভেণ্ডিং মেশিন আছে। অবস্থা তেমন খারাপ হলে সেখানকার সোফায় আরাম করে রাত কাটান যাবে।

লাউঞ্জের শেষ প্রান্তে একটি ছেলে এবং খুবই অল্পবয়সী একটি মেয়ে জড়াজড়ি করে বসে ছিল। ছেলেটি এক হাত দিয়ে মেয়েটির জামার হুঁক খোলবার চেষ্টা করছে। মেয়েটি বাধা দেবার একটি ভঙ্গি করছে এবং খিলখিল করে হাসছে। আনিস না দেখার ভান করে ভেণ্ডিং মেশিনের দিকে এগোল। এই সময় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। এখানে এরকম হয় না কখনো। হাজারো দুর্যোগেও এদের ইলেকট্রিসিটি ঠিকই থাকে। মনে হচ্ছে মেয়েটি উঠে আসছে সোফা থেকে।

তোমার কাছে কি সিগারেট আছে?

আছে।

আমি কি তোমার একটি সিগারেট ধার নিতে পারি?

আনিস সিগারেট বের করল। মেয়েটি ফস করে লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল। বাদামী রঙের ঢেউ-খেলান চুল মেয়েটির। টানা টানা চোখ। লাইটারের আলোর জন্যেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, আনিসের মনে হল মেয়েটির মুখ যেন এইমাত্র কেউ তুলি দিয়ে এঁকেছে।

সিগারেটের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।

ছেলে-মেয়ে দুটি পিয়ানোর আড়ালে চলে গেল। মেয়েটি অনবরত হাসছে খিলখিল করে। হাসির ধরন কেমন অসংলগ্ন। নিশ্চয়ই প্রচুর বিয়ার খেয়েছে। আনিস লম্বা হয়ে সোফায়

শুয়ে পড়ল। ইলেকট্রিসিটি এখনো আসছে না। ট্রান্সমিশন লাইন কোথায়ও পুড়েটুড়ে গেছে বোধহয়। মেয়েটির চাপা গলার স্বর শোনা যাচ্ছে।

আহ্ কী অসভ্যতা করছ? হাত সরাও প্লীজ।

আবার খিলখিল হাসি। তারপর দীর্ঘ সময় আর কিছুই শোনা গেল না। বাইরে ঝড়ের বেগ বাড়ছে। ঘন ঘন বিজলি চমকাচ্ছে। আনিস শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন ঝড় থেমে গিয়েছে। ইলেকট্রিসিটি এসেছে। মেমোরিয়েল ইউনিয়ন আলোয় ঝলমল করছে। ছেলেটি নেই, মেয়েটি টেবিলে পা তুলে বসে আছে এক এক।

তোমার কাছ থেকে কি আমি আরেকটি সিগারেট নিতে পারি?

আনিস একটি সিগারেট দিল। মেয়েটি সিগারেট ধরিয়ে ক্লান্ত স্বরে বলল, তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে?

না। কেন বল তো?

গাড়ি থাকলে তোমাকে একটা লিফটের জন্যে অনুরোধ করতাম।

সরি, গাড়ি নেই আমার।

তুমি থাক কোথায়?

টুয়েলভ এ্যাভিন্যু।

তোমার সঙ্গে আমি টুয়েলভ এ্যাভিন্যু পর্যন্ত হেটে হেটে যেতে পারি, কি বল?

তা পার।

আমার বড্ড মাথা ধরেছে। মেয়েটি বা হাতে তার কপাল টিপে ধরল। আনিস বলল, তোমার ছেলে বন্ধুটি কোথায়?

ও আমার বন্ধু হবে কেন? কোথায় গেছে কে জানে? ওর সঙ্গে বকবক করেই তো আমার মাথা ধরেছে।

বৃষ্টি নেই। কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। রাস্তায় নেমেই মেয়েটি খুব সহজ ভঙ্গিতে আনিসের হাত ধরল।

তোমার এ্যাপার্টমেন্টে কি টাইনানল আছে?

আছে।

মনে হয় আমার জ্বর আসছে। দুটি টাইনানল এবং গরম কফি খেতে পারলে হত।

আনিস কথা বলল না। মেয়েটির সত্যি সত্যি জ্বর আসছে। হাত বেশ গরম।

আমি কি তোমার এ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে এক কাপ গরম কফি খেতে পারি? রাত বেশি হয় নি, তাই জিজ্ঞেস করছি।

হ্যাঁ, খেতে পোর।

আমাকে আরেকটা সিগারেট দাও।

মাথা ধরা তাতে আরো বাড়বে।

আমি তাতে কেয়ার করি না। আমি কোনো কিছুতেই কেয়ার করি না।

তা ভালো।

ভালো হোক, মন্দ হোক, আমি কেয়ার করি না।

বাসার সামনে এসে মেয়েটি থমকে দাঁড়াল। অবাক হয়ে বলল, এত বড়ো বাড়ি! এটা তোমার?

ভাড়া দিয়ে থাকি। নিজের নয়।

আমি ভেবেছিলাম তুমি স্টুডেন্ট।

না, আমি স্টুডেন্ট নই।

আনিস টাইনানল নিয়ে এল। পানির বোতল আনল। মেয়েটি ক্ষীণ স্বরে বলল, আমার জ্বর আসছে। তোমার কাছে থার্মোমিটার আছে?

না, থার্মোমিটার নেই।

তোমার গাড়ি থাকলে ভালো হত, আমাকে পৌঁছে দিতে পারতে।

আমি আমার এক বন্ধুকে টেলিফোন করছি। সে তোমাকে পৌঁছে দেবে।

আমি কি তোমার এখানে এক রাত থাকতে পারি? ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না আমার।

আনিস চুপ করে রইল। মেয়েটি থেমে বলল, কি, থাকতে পারি?

তা পার।

আমাকে শোবার ঘর দেখিয়ে দাও। আমার বড্ড খারাপ লাগছে।

শোবার এই ঘরটি চমৎকার করে সাজান। মেয়েটি খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখল অনেকক্ষণ। তারপর খানিক ইতস্তত করে বলল, তুমিও কি শোবে আমার সঙ্গে?

না।

আরো শোবার ঘর আছে?

হ্যাঁ।

মেয়েটি পায়ের জুতা খুলল। মাথায় স্কার্ফ বাঁধা ছিল, স্কার্ফ খুলে মুখ মুছল। তারপর খুব সহজভাবে বলল, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। অবশ্যি তোমার ইচ্ছা! হলে আমার সঙ্গে শুতে পার। আমি কিছুই কেয়ার করি না।

নাম কি তোমার?

মালিশা।

শুভরাত্রি মালিশা।

মালিশা কোনো জবাব দিল না। আনিস ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভাবল, কাজটা বোধহয় ঠিক হল না। এইসব হোবো শ্রেণীর মেয়েদের ঘরে থাকতে দিতে নেই। হয়তো একটি প্রস্টিটিউট। শহরের নষ্ট মেয়েদের এক জন। কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। মন খারাপ হয় শুধু।

টিভিতে জনি কার্সন শো হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট কার্টার দাঁত বের করে কী ভাবে হাসে, তাই দেখাচ্ছে। আহা মারি কোনো অভিনয় নয়, এতেই স্টুডিওর লোকজন হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে। চ্যানেল ফোরে লেট নাইট মুভি শুরু হল। অর্থাৎ রাত বেশি। হয় নি! একটা এখনো বাজে নি। আনিস কফি বানোল। ঘুমুতে যাওয়ার আগে কফি খাবার এই একটি বিশ্রী অভ্যাস তার আমেরিকায় এসে হয়েছে।

মালিশা কি কফি খাবে? সম্ভবত না। মেয়েটিকে থাকতে দেওয়া ভুল হয়েছে। ড্রাগস-ট্রাগস খেয়ে এসেছে কিনা কে বলবে? হয়তো রাতদুপুরে চেঁচামেচি শুরু করবে!

আনিস ঘুমুতে গেল অনেক রাতে। বাতি নেভাবার ঠিক আগের মুহূর্তে মনে হল, আজ সন্ধ্যায় যে মহিলা কবির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাঁর নাম মনে পড়ছে না। চমৎকার একটি নাম। খুব সম্ভবত এম দিয়ে শুরু হয়েছে। নামটি মনে না-আসা পর্যন্ত কিছুতেই ঘুম আসবে না। ছটফট করতে হবে বিছানায়। পুরনো সেই রোগ আবার দেখা দিচ্ছে। স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে উঠছে। ঘাড়ের পাশের রাগ দুটি ফুলে উঠছে। কাউকে জিজ্ঞেস করলে হয় না? শফিক তো অনেক দিন ধরে আছে এইখানে, এত রাত্রে টেলিফোন করাটা কি ঠিক হবে?

হ্যালো শফিক? জেগে ছিলে?
হ্যাঁ। কী ব্যাপার?
আচ্ছা শোন, তুমি কি এখানকার কোনো মহিলা কবিকে চেন? বেশ বয়স ভদ্রমহিলার।
শফিক বেশ কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল, কী ব্যাপার আনিস ভাই?

কোনো ব্যাপার না, এম্নি জিজ্ঞেস করছি। ভদ্রমহিলার নাম এম দিয়ে শুরু।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কী জন্যে?

আনিস লাইন কেটে দিল। শফিক এখন নির্ঘাত আবার টেলিফোন করবে। কাজেই এখন প্লাগ থেকে টেলিফোন খুলে রাখা উচিত।

আনিসের সারা রাত ঘুম হল না। ঘুম এল ভোরবেলা।

২. ফার্গো খুবই ছোট শহর

ফার্গো খুবই ছোট শহর।

আমেরিকানরা একে সিটি বলে না, বলে টাউন। সাধারণ একটি সিটিতে যা যা থাকে, এখানে তার সবই অবশ্যি আছে। আকাশছোঁয়া দালানই শুধু নেই। দুটি নাইট ক্লাব আছে। মেয়েরা সেখানে নগ্ন হয়ে নাচে। একটা বড়ো ক্যাসিনো আছে। সেখানে সপ্তাহে ছ দিন দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা ব্লাক জ্যাক খেলা হয়। অত্যাধুনিক শপিং মল আছে বেশ কয়েকটি, তবু-ফার্গো সিটি নয়, টাউন। নিউইয়র্ক বা শিকাগো থেকে যে-সব বাঙালী এখানে আসে তারা চোখ কপালে তুলে বলে, আরো এ তো আমাদের কুমিল্লা শহর। ভিড় নেই হৈ-চৈ নেই। বাহ্, চমৎকার তো!

কিন্তু বেশিদিন কেউ থাকে না। এখানে। শীতের সময় প্রচণ্ড শীত পড়ে। কানাডা থেকে উড়ে আসে ঠাণ্ডা হাওয়া। থার্মোমিটারের পারদ ক্রমশ নিচে নামতে থাকে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি তাপমাত্রা শূন্যের ত্রিশ ডিগ্রী নিচে নেমে থমকে দাঁড়ায়। অসহনীয় অকল্পনীয় ঠাণ্ডা। একটা শীত কোনোমতে কাটাবার পরই ফার্গোর মোহ কেটে যায়। ঘরের মধ্যে ছ মাস বন্দী হয়ে থাকতে পারে কেউ? বাঙালীরা মুখ কুচকে বলাবলি করে, এখানে মানুষ থাকতে পারে? এখানে বাস করতে পারে পোলার বিয়ার আর সীল মাছ।

তবু অনেকেই আসে। ঘরবাড়ি কিনে স্থায়ী হয়ে যায় কেউ কেউ। যেমন স্থায়ী হয়েছেন আমিন সাহেব। শহরে বাড়ি করেছেন। মিনেসোটায় পেলিকেন লেকের ধারে সামার হাউস

কিনেছেন। বিশ বছর আগে যে-দেশ ছেড়ে এসেছিলেন, আজ আর তার জন্যে মন কাঁদে না।

অথচ শুরুতে কী দিন গিয়েছে! ইউনিভার্সিটি থেকে সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত হয়ে ফিরতেন। ঘরে রাহেলা একা। কিছুই করবার নেই। কতক্ষণ আর টিভির সামনে বসে থাকা যায়? একা একা দোকানে ঘুরতে কার ভালো লাগে? আমিন সাহেব সান্ত্বনা দিতেন, আর একটা মাত্র বৎসর। পি... এইচ... ডি করব না। এম... এস... করে ফিরে যাব। আর মাত্র কয়েকটা দিন কষ্ট কর।

পরিবর্তন হল খুব ধীরে। আমিন সাহেব একদিন অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, রাহেলা চমৎকার ইংরেজি শিখেছে।

বাহ্, তুমি তো চমৎকার ইংরেজি বল! কোত্থেকে শিখেছি? একেবারে আমেরিকান এ্যাকসেন্ট। কীভাবে শিখলে?

টিভি দেখে দেখে শিখেছি। কী আর করব বল? দু বছরের মাথায় চাকরি হল রাহেলার। আহামরি কিছু নয়। রিসার্চ ল্যাবে সূর্যমুখী ফুলের চারা বাছা। সেই বছর গাড়ি কিনলেন আমিন সাহেব। নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান মডেল ডজ পোলারা। প্রকাণ্ড গাড়ি। নিজের গাড়িতে করে স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন ডেভিলস লেকে। রাহেলার মনে হল সে বোধহয় আগের মতো অসুখী নয়।

দেখতে-দেখতে কত দিন হয়ে গেল। প্রচুর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেশে যাওয়া হয়ে উঠল না। বেড়াতে যাবার জন্যেও নয়। একটা-না-একটা ঝামেলা থাকেই। পিএইচ.ডির বছর

সূচিপত্র

দেশে যাবে না। নতুন চাকরি, দেশে যাওয়া যাবে না। ইমিগ্রেশন না হওয়া পর্যন্ত বের হওয়া ঠিক হবে না। নতুন বাড়ি কেনা হয়েছে। এখন বাড়ি ঠিকঠাক করতে হবে, দেশে যাওয়া পিছতে হবে। প্রথম বাচ্চা হবে, এ সময়টা তো আমেরিকাতে থাকতেই হবে।

তারা প্রথম বারের মতো যখন দেশে গেল তখন রুনকির বয়স চার বছর। প্রায় এক যুগ পর দেশে ফেরা। কি দারুণ উত্তেজনা গিয়েছে। কিন্তু দেশে ফিরে কিছুই ভালো লাগল না। নোংরা ঘরবাড়ি। দেয়ালগুলি ময়লা। রাতের বেলা কেমন অন্ধকার অন্ধকার লাগে চারদিক। মানুষজনও কেমন যেন বদলে গেছে। কেউ যেন ঠিক সহজ হতে পারে না। বড় খালা, যিনি সারা জীবন তুই তুই করে কথা বলতেন, তিনি পর্যন্ত তুমি বলা শুরু করলেন।

এক মাস পরই রুনকি পড়ে গেল অসুখে। যা খায়, কিছুই হজম করতে পারে না। রাহেলা আমেরিকা ফিরে এসে হপ ছাড়ল।

দেখতে-দেখতে কত দিন হয়ে গেল। বিশ বছর অনেক লম্বা সময়। রাহেলার বাবা-মা মারা গেলেন। আমিন সাহেবের বাবা-মা তো আগেই ছিলেন না। কোনো পিছুটান রইল না। রাহেলার সবচেয়ে ছোট বোনটির বিয়ে হয়ে গেল। কোথায় আছে সে, কিছুই জানা নেই। জানিবার জন্যে সে রকম উৎসাহও এখন হয় না। সবকিছু যেন হারিয়ে গেছে। আজকাল আয়নায় মুখ দেখলে রাহেলার তীক্ষ্ণ ব্যথা বোধ হয়। মুখের চামড়া শ্লথ হয়ে এসেছে। কানের দু পাশের সাদা চুল সাপের মতো কিলবিল করে। এখন তাঁর অন্য এক ধরনের আলস্য বোধ হয়। সকালবেলা চেয়ার পেতে বারান্দায় একা একা বসে থাকেন। আমিন সাহেব তাঁকে বিরক্ত করেন না। কেমন একটা দূরত্ব এসে গেছে তাঁদের মধ্যে। মাঝে মাঝে রুনকি আসে, ঝড়ের মতো।

আবার তুমি চেয়ার নিয়ে বসেছ? শিকড় গজিয়ে শেষে তুমি একটা গাছ হয়ে যাবে মা।

আয়, তুইও বোস।

হুঁ, আমার যেন কোনো কাজ নেই!

রুনকি দেখতে তাঁর মতো হয় নি, তবু চমৎকার হয়েছে। গায়ের রঙ চাপা, কিন্তু কী কালো শান্ত চোখ। তাকালেই কেমন যেন মন খারাপ হয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রুনকি যখন চুল ব্রাশ করে, তিনি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন। রুনকি ঠোঁট বাঁকায়, এমন করে তাকাও কেন মা?

কেমন করে তাকাই?

কেমন যেন পুরুষ-পুরুষ চোখে তাকাও।

তিনি তাঁর নিজের মেয়েকে একটুও বুঝতে পারেন না। মাঝে মাঝে অনেক কায়দা করে জিজ্ঞেস করেন, তুই কী রকম ছেলে বিয়ে করতে চাস রুনকি?

বিয়ের কথা আমি মোটেই ভাবছি না। বছরের পর বছর একটা ছেলের সঙ্গে থাকা বড্ড আগলি।

এসব আবার কী ধরনের কথা?

সত্যি কথাই বলছি তোমাকে। যে-সব ছেলে আমার সঙ্গে ডেট করে, তুমি কি ভাবছ আমি ওদের কাউকে বিয়ে করার কথা ভাবি? হলি কাউ। তাছাড়া ওরাও বিয়ে করতে চায় না। ভুলিয়েভালিয়ে ঘরে নিয়ে শুতে চায়।

রাহেলা মুখ কালো করে বললেন, তুই নিশ্চয়ই ওদের ঘরে যাস না?

মা, যাই কি না-যাই সেসব আমি তোমার সঙ্গে ডিসকাস করতে চাই না! আমার বয়েস উনিশ হয়েছে। তোমাদের কোনোই রেসপনসিবিলিটি নেই।

রাহেলা চান একটি হৃদয়বান এবং বুদ্ধিমান বাঙালী ছেলেকে বিয়ে করবে রুনকি। জীবনে যে-সমস্ত সুখ ও আনন্দের কথা তিনি সারা জীবন কল্পনা করেছেন, তাঁর মেয়ে সে-সব ভোগ করবে। কিন্তু এই দূর দেশে তেমন ছেলে পাওয়া যাবে কোথায়? রাহেলা লং ডিসটেন্সে পরিচিত সবাইকে একটি ছেলের কথা বলেন। খোঁজ যে আসে না, তাও নয়। প্রথমেই জানতে চায় মেয়ের কি ইমিগ্রেশন আছে? বিয়ে করলে এখানে থেকে যাবার ব্যাপারে কোনো সাহায্য হবে কি? মেয়ের ছবি দেখতে চায় না, মেয়েটিকে দেখতে চায় না। গ্রীন কার্ড দেখতে চায়।

আমিন সাহেব নিজের ঘরে বসে কী যেন লিখছিলেন। একতলার সর্বপশ্চিম কোণার ছোট ঘরটি তাঁর নিজস্ব ঘর। ঘরটিতে আসবাব বলতে ছোট একটা লেখার টেবিল, একটা ইজিচেয়ার, বুকশেলফ। বুকশেলফে কয়েকটি রেফারেন্স বই, ন্যাশনাল জিওগ্রাফির কিছু পুরনো সংখ্যা এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইছামতী ছাড়া অন্য কোনো বই নেই। আমিন সাহেব মাঝেমাঝেই দরজা বন্ধ করে এই ঘরে বসে কী-যেন লেখেন। রাহেলা কৌতূহল হলেও কখনো কিছু জিজ্ঞেস এই ঘরে বসে কী-যেন লেখেন। রাহেলার কৌতূহল

হলেও কখনো কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। আমিন সাহেবের কোনো বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করতে আজ আর তাঁর ভালো লাগে না।

রাহেলা দরজায় দু বার টোকা দিয়ে মৃদু গলায় বললেন, আসব? জবাব পাবার আগেই তিনি পর্দা সরিয়ে আমিন সাহেবের ঘরে ঢুকলেন। আমিন সাহেব তাঁর লেখাটি আড়াল করবার চেষ্টা করলেন। রাহেলা ভান করলেন যেন তিনি এসব কিছুই লক্ষ করছেন না।

আমি আজ সন্ধ্যায়। কয়েক জনকে খেতে বলেছি। আমিন সাহেব কোনো উত্তর দিলেন না। তুমি টিচি থেকে শুঁটকি মাছ এনে দেবে।

শুঁটকি মাছ পাওয়া যায়?

মাঝে মাকে যায়।

আমি নিয়ে আসব।

রাহেলার মনে হল আমিন সাহেব অস্বস্তিবোধ করছেন, যেন তিনি চান না রাহেলা এখানে থাকে। কিন্তু এ-রকম মনে করার কারণ কী? রাহেলা নিজের অজান্তেই বলে ফেললেন, কী লিখছ?

তেমন কিছু নয়।

রাহেল খানিকক্ষণ সরু চোখে তাকিয়ে থেকে তোতলায় চলে গেলেন। দোতলার একেবারে শেষ কামরাটি রুনকির। সে দরজা বন্ধ করে গান শুনছে।

রুনকি, দরজা খোল তো মা।

রুনকি দরজা খুলে দিল। তার চোখ ভেজা। মনে হল সে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছে।

কী হয়েছে রুনকি?

কিছু না মা। নেইল ডাইমণ্ডের গান শুনছিলাম। ওর গান শুনলে খুব লোনলি ফিলিং হয়।

রুনকি মিষ্টি করে হাসল। রাহেলা থেমে থেমে বললেন, আমি কয়েকটি ছেলেকে খেতে বলেছি। তুমি সন্ধ্যাবেলা যেও না কোথাও।

ঠিক আছে, মা।

তোমার নীল শাড়িটা পরবে।

বেশ। বিশেষ কাউকে আসতে বলেছ?

রাহেলা ইতস্তত করে বললেন, আনিস নামের একটি ছেলে আসার কথা, এনডি-এস-ইউয়ের টীচার, খুব ভালো ছেলে।

কী করে বুঝলে–খুব ভালো ছেলে?

শাফিক বলেছে।

রুনকি হাসি-হাসি মুখে বলল, নিশ্চয়ই আনিমেরিড। এবং নিশ্চয়ই তুমি চাও আমি খুব ভদ্র—নমভাবে তার সঙ্গে কথা বলি।

চাওয়াটা কি খুব অন্যায়?

না, অন্যায় হবে কেন? তবে মাস্টারদের আমি দু চোখে দেখতে পারি না।

রাহেলা কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল। রুনকি বলল, তোমার চিন্তার কিছুই নেই। আমি খুব ভদ্র ও নাম ভাবে থাকব, একটুও ফাজলামি করব না। দেখবে, মিষ্টি মিষ্টি হাসছি শুধু।

৩. আনিসের ঘুম ভাঙল

আনিসের ঘুম ভাঙল এগারটায়।

সে কয়েক মুহূর্ত নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না, সত্যি সত্যি এগারটা বাজে। আজ শুক্রবার, সাড়ে নটায় একটা ক্লাস ছিল। তিন শ ছয় নম্বর কোর্স পলিমার রিয়োলজি। এখন অবশ্যি করার কিছুই নেই। মিস ক্যাথরীনকে টেলিফোন করে দিতে হবে। ক্লাস মিস করা তেমন কোনো ব্যাপার নয়। সময় করে নিয়ে নিলেই হবে। কিন্তু ঘুমের জন্যে ক্লাসে না যেতে পারাটা লজ্জার ব্যাপার।

আনিস টেলিফোন হুঁক লাগান মাত্রই টেলিফোন বেজে উঠল।

হ্যালো আনিস ভাই? আমি শফিক।

বুঝতে পারছি।

কাল রাত থেকে এই নিয়ে ছয় বার টেলিফোন করেছি। আপনি কি টেলিফোন ডিসকানেক্ট করে রেখেছিলেন?

হ্যাঁ।

আমি ভাবলাম, কী ব্যাপার? এদিকে আপনার মহিলা কবির নাম পেয়েছি, নাম হচ্ছে মেরি স্টুয়ার্ট।

আনিস ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল, মেরি স্টুয়ার্ট নয়। ভদ্রমহিলার নাম এমিলি জোহান। রাত্রে মনে করতে পারছিলাম না, এখন মনে হয়েছে।

আনিস ভাই, আপনার কি শরীর খারাপ?

না, শরীর ঠিক আছে।

আমিন সাহেবের বাসায় যাবার কথা মনে আছে তো?

আজকে তো নয়, কাল।

হ্যাঁ, কাল। শুনুন আনিস ভাই, আমি আসছি।

এখন?

এই দশ মিনিটের মধ্যে। সিরিয়াস কথা আছে।

আনিস টেলিফোন রেখে চায়ের পানি বসিয়ে দিল। পানি গরম হতে–হতে হাতমুখ ধুয়ে আসা যাবে। হাত-মুখ ধুতে গিয়ে মনে পড়ল, আরেকটি প্রাণী আছে। আশ্চর্য, এত বড়ো একটা ব্যাপার। এতক্ষণ মনে পড়ল না কেন?

কিন্তু মালিশা ছিল না। ঘরের বিছানা সুন্দর করে পাতা। বিছানার উপর এক টুকরো সাদা কাগজ পড়ে আছে। আনিস দেখল। সেখানে পেন্সিলে লেখা–তুমি ঘুমোচ্ছ দেখে জাগালাম না। অনেক ধন্যবাদ। আনিসের কেন যেন একটু মন খারাপ লাগল। অথচ মন খারাপ

হবার কোনো কারণ নেই। আজকের দিনটি খুবই খারাপ যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এ-রকম খারাপ দিন আসে। কোনো কিছুই ঠিক মতো হয় না।

শফিকের দশ মিনিটের মধ্যে আসার কথা। সে দু ঘণ্টার মধ্যেও এল না। মিস ক্যাথরীনকেও টেলিফোন করে পাওয়া গেল না। ইউনিভার্সিটিতে এখন গিয়ে হাজির হওয়ার কোনো মানে হয় না। আনিসের মনে হল তার জ্বর আসছে। কী ভয়ঙ্কর খারাপ দিন। টিভি-র নিউজ চ্যানেলে পর্যন্ত একটিও ভালো খবর নেই–

ক্যান্টাকিতে দুটি শিশুকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।

সল্ট টু ট্রিটির আলোচনা ভেস্তে গেছে।

বেলজিয়ামের লিয়েগো শহরে একটি ট্রেন নদীতে পড়ে দেড় শ লোকের সলিলসমাধি হয়েছে।

বাগানে চেয়ার সাজান হয়েছে।

রুনকির মনে হল, তার মা কিছুটা বাড়াবাড়ি করছে। দু বার টেবিলক্লথ পাল্টান হয়েছে। ফুলদানিতে ফুল সাজান হয়েছে স্টেরিও সিস্টেমকে টেনে আনা হয়েছে বাইরে।

রুনকি বলল, মা তুমি বড্ড হুলস্থূল করছ!

রাহেলা অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁর কপালের চামড়ায় সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ল, বাইরে চেয়ার পেতে বসলে বুঝি হুলস্থূল হয়?

তা হয় না, কিন্তু ফুলদানি রাখলে হুলস্থূল হয়। তুমি ছয় ডলার খরচ করে ফুল আনিয়েছ মা।

বেশ তো, তোমার অপছন্দ হলে ফুলদানি তুলে নাও।

রুনকি অপ্রস্তুত হল। তার মা স্পষ্টই রেগে গেছেন। সে তার মাকে ঠিক বুঝতে পারে না। অত্যন্ত ছোট কারণে তিনি অসম্ভব রেগে যেতে পারেন। রুনকি হাসিমুখে বলল, মা, তুমি যদি চাও তাহলে আমি নীল শাড়িটা পরব।

আমার আবার চাওয়াচাওয়ি কি রুনকি? আমি কখনো কারো কাছে কিছু চাই নি।

রুনকি মুখ কালো করে তার ঘরে চলে গেল। এমন একটি চমৎকার দিন কেমন করেই নি। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রুনকি তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। এই ঘরে নিজের মনে কাঁদা যায়। উঁচু ভল্যুমে গান বাজান যায়। এটি তার নিজের গোপন

থৈবী। পৃথি টুকটুক করে টোকা পড়ছে দরজায়। নিশ্চয়ই বাবা। এমন শালীন ভঙ্গিতে বাবা ছাড়া আর কেউ দরজা নক করতে পারেন না। রুনকি নরম গলায় বলল, কী চাও, বাবা?

দরজা খোল বেটি। তোমার জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে।

কী সারপ্রাইজ?

খুলেই দেখ।

রুনকি রেরিয়ে এল, তার দু চোখ ভেজা। চুল এলোমেলো।

তোমার জন্যে একটি গিফট প্যাকেট এসেছে। ইটালি থেকে। ইটালিতে কে আছে তোমার মা?

টম। সামার কাটাতে গিয়েছে।

রুনকি প্যাকেট খুলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্লাষ্টার অব প্যারিসের তৈরি অপূর্ব একটি নারীমূর্তি। নিশ্চয়ই মাইকেল এঞ্জেলোর কোনো ভাস্কর্যের ইমিটেশন। রুনকি গাঢ় স্বরে বলল, কী সুন্দর, দেখেছি!

শ্যাঁসুন্দর। খুবই সুন্দর।

মাকে দেখিয়ে আনি।

রুনকি ছুটে বেরিয়ে গেল।

রাহেল রানাঘরে। রানাবান্নার কাজ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। খাবার দাবার গরম রাখার জন্যে শুধু ওভেনে দিয়ে রাখা। অনেক রকম আয়োজন হয়েছে, তবু রাহেলার মনে হচ্ছে আয়োজন পূর্ণাঙ্গ হয় নি। কাঁচামরিচ নেই ঘরে। হর্নবাকারসে কাঁচামরিচ পাওয়া যায় নি।

তিনি বা আমিন সাহেব কেউ অবশ্যি ঝাল খান না, তবে প্রবাসী বাঙালীরা খাবার টেবিলে কাঁচামরিচ দেখতে ভালোবাসে।

মা দেখ, টম কী পাঠিয়েছে।

কোন টম, পাগলা টম?

রুনকি রেশ বিরক্ত হল। টম আবার ক জন আছে যে, পাগলা টম বলতে হবে? রুনকি বলল, মূর্তিটি আমি বাগানে সাজিয়ে রাখি মা? তোমার অতিথিরা দেখলে অবাক হবে।

রাহেলা থেমে থেমে বললেন, না রুনকি, এটি তোমার ঘরেই থাক। মূর্তিটি অশালীন।

রুনকি স্তম্ভিত হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ঝড়ের বেগে দোতলায় উঠে গেল।

অতিথিদের মধ্যে প্রথম এলেন নিশানাথ রায়। গ্রাণ্ড ফোকস ইউনিভার্সিটির অঙ্কের প্রফেসর। ভদ্রলোকের বয়স ৫৫, কিন্তু দেখায় ৭০-এর মতো। লম্বা দড়িপাকান চেহারা। যে-কোনো নিমন্ত্রণে সবার আগে এসে উপস্থিত হন এবং নিরিবিলি একটি কোণ বেছে চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন কিংবা ঘুমান। আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতেও ক্লাস নিতে গিয়ে একই কাণ্ড। তবু তিনি টিকে আছেন, কারণ টপলজিতে এক জন প্রথম শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁকে এখনো ধরা হয় (যদিও টপলজি তিনি ছেড়েছেন দশ বছর আগে)। অনেকের ধারণা, গ্রাণ্ড ফোকাস ইউনিভার্সিটির নাম লোকে জানে, কারণ প্রফেসর নিশানাথ এখানে মাস্টারি করেন।

নিশানাথ বাবু তাঁর স্বভাবমতো পাঁচটার দিকেই এসে পড়লেন এবং লজ্জিত স্বরে বললেন, দেরি করে ফেললাম নাকি?

আমিন সাহেব হাসিমুখে বললেন, না, দেরি হয় নি। চা দেব, না লিকার?

নিশানাথ বাবু বিড়বিড় করে কী-যেন বললেন। পরিষ্কার বোঝা গেল না। তিনি বেছে বেছে সবচেয়ে পেছনের একটি চেয়ারে পা উঠিয়ে বসলেন। আমিন সাহেব মার্টিনির একটি বড়ো গ্লাস নিয়ে এসে দেখেন, নিশানাথ বাবু চোখ বন্ধ করে ফেলেছেন।

নিশানাথ বাবু নিন, মার্টিনি এনেছি।

ইয়ে–কি যেন বলে, আমি অবশ্যি চা চেয়েছিলাম।

চা নিয়ে আসতে পারি, পানি গরম আছে।

নিশানাথ বাবু তার উত্তর দিলেন না। চুপচাপ বসে রইলেন।

রাত আটটা বেজে গেল। অন্য দু জন নিমন্ত্রিতের কোনো খোঁজ নেই। শফিকের ঘরে টেলিফোন করা হল কয়েক বার, কেউ ধরল না। রুনকি বলল, নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধা হয়েছে মা। তুমি এমন মুখ কালো করে থেক না।

কী আজেবাজে কথা বল রুনকি? মুখ কালো করব কেন?

আমি সরি মা।

ঠিক আছে খেতে বাস।

নিশানাথ বাবু নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছেন। আমিন সাহেব একবার বললেন, রান্না কেমন হয়েছে নিশানাথ বাবু?

নিশানাথ বাবু তার জবাব দিলেন না। তিনি কখনো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের জবাব দেন না। রুনকি বলল, নিশা চাচার জিহ্বায় কোনো টেষ্টব্যাড নেই। তিনি যাই খান তাই তাঁর কাছে ঘাসের মতো লাগে। তাই না চাচা?

নিশানাথ বাবু তার উত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তখন টেলিফোন বাজল। টেলিফোন ধরল রাহেলা।

হ্যালো, আমি শফিক।

রাহেলা শুকনো গলায় বললেন, আমরা সবাই খেতে বসেছি, একটু পরে ফোন করতে পার?

রাহেলা কঠিন মুখ করে খেতে বসলেন। রুনকি মায়ের দিকে না তাকিয়ে বলল, মা, এটা কিন্তু তুমি ঠিক করলে না।

রাহেলা উত্তর দিলেন না। নিশানাথ বাবু বললেন, প্রচুর আয়োজন করেছেন। মনেই হয় না বিদেশ।

রুনকি বলল, মা ওদের হয়তো বিশেষ কোনো ঝামেলা হয়েছে। টেলিফোন নামিয়ে না রেখে তোমার উচিত ছিল

আমার কী উচিত-অনুচিত তা আমি তোমার কাছ থেকে শিখতে চাই না! তুমি ভাজা মাছ আরো নেবে?

না।

নিশানাথ বাবু, আপনি নেবেন?

নিশানাথ বাবু অবাক হয়ে বললেন, এটা ভাজা মাছ? আমি ভাবছিলাম...

রুনকি বলল, তুমি শুধু শুধু রাগ করছ মা। ওদের নিশ্চয়ই বড়ো রকমের কোনো ঝামেলা হয়েছে।

নিশানাথ বাবু বললেন, কাদের ঝামেলা হয়েছে?

যাদের আসবার কথা ছিল, তাদের।

কী ঝামেলা?

সেটা এখনো জানা যাচ্ছে না। হয়তো ভদ্রলোক বাথরুমে গিয়ে দেখেন বাথটাবে একটি ডেডবিডি পড়ে আছে। ডেডাবডিটির পিঠে একটি ওরিয়েন্টাল কাজ করা ছুরি।

আমিন সাহেব হেসে ফেললেন।

হাসির কী হল বাবা? হতেও তো পারে।

নিশিনাথ বাবু বললেন, এদেশে সবই সম্ভব। খুন খারাবি এদের কাছে কিছুই না, অতি অসভ্য বর্বরের দেশ।

ঝামেলাটা কী হয়েছে তা জানা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। গাড়ি নিয়ে হাইওয়েত আটকা পড়েছে। শফিকের প্রাচীন ফোর্ড ফিয়াসটার ট্রান্সমিশন কাজ করছে না। হাইওয়ের একটি রেস্ট হাউসে বসে আছে দু জন। রুনকি বলল, রাস্তার মাঝখানে গাড়ি নিয়ে আটকা পড়া দারুণ এক্সাইটিং।

রাহেলা ভ্রূ কোঁচকালেন। ঠাণ্ডা স্বরে বললেন, এর মধ্যে এক্সাইটিং কী দেখলে তুমি? সাধারণ মানুষদের মতো ভাবতে শেখ। গাড়ি নিয়ে আটকা পড়াটা হচ্ছে যন্ত্রণা। এক্সাইটমেন্ট নয়।

তুমি এত রেগে রেগে কথা বলছ কেন মা?

রুনকি, কথা বন্ধ করে গাড়ি নিয়ে ওদের খোঁজে যাও। তোমার বাবাকে পাঠাব না। সন্ধ্যা থেকে মার্টিনি খাচ্ছে, ওর হাত স্টেডি নেই।

কথাটা ঠিক নয়। দু পেগের মতো মার্টিনি আমিন খেয়েছেন। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। রাহেলার মেজাজ চড়ে আছে। চুপ করে থাকাই ভালো। নিশানাথ বাবু বসার ঘরের সোফায়

পা গুটিয়ে আবার ধ্যানস্থ হয়েছেন। আমিন তাঁর পাশে এসে বসতেই তিনি বললেন, বুঝলেন, অতি অনুসভ্য, অতি বর্বর জাত।

রাহেলা রুনকির সাথে গ্যারাজ পর্যন্ত গেলেন। রুনকির হাতে চাবি দিয়ে বললেন, নতুন ছেলেটির সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করবে।

রুনকি অবাক হয়ে বলল, আমি অভদ্র মা! কী বলছ তুমি? যা বলছি মন দিয়ে শোন। আমি চাই তুমি বাঙালী ছেলেদের সঙ্গে কিছুটা মেলামেশা কর।

রুনকি চুপ করে রইল। রাহেলা বললেন, তোমার একটি ভালো বিয়ে হোক, সেটাই আমি চাই। আমি তোমাকে হ্যাপি দেখতে চাই।

বাঙালী ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলেই আম হ্যাপি হব? তোমার তো বাঙালি ছেলের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে। তুমি কি হ্যাপি?

রাহেলা উত্তর দিলেন না।

রুনকি বলল, এইসব নিয়ে আমি এখন ভাবতে চাই না। আর আমি চাই না, তুমিও ভাব। ইদানীং আমাকে নিয়ে তুমি বেশি চিন্তা করছি।

তুমি বলতে চাও, চিন্তার কিছু নেই?

রুনকি গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। রাহেলা বললেন, শাড়ি একটু উপরের দিকে টেনে নাও। এক্সিলেটরের সঙ্গে যেন না লেগে যায়।

হাইওয়েতে নেমেই রুনকি গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে সত্বরে নিয়ে এল। গ্র্যাণ্ড ফোকস থেকে ফার্গো ইন্টারস্টেট হাইওয়ে ফাঁকা থাকে বলেই পুলিশটুলিশ তেমন থাকে না। যত ইচ্ছা স্পীড তোলা যায় গাড়িতে। রুনকির বান্ধবী শ্যারন এক বার পচানব্বুই পর্যন্ত তুলেছিল। কি প্রচণ্ড কাঁপুনি গাড়ির। রুনকির এতটা সাহস নেই। সত্বরেই তার খানিকটা হাত কাঁপে। তা ছাড়া ফল সিজন বলেই গাছের পাতা ঝরছে। শুকনো পাতার উপর দিয়ে গাড়ি গেলেই অদ্ভুত শব্দ হয়, কেমন যেন ভয়ভয় করে।

আপনাদের নিতে এসেছি আমি।

আনিস মেয়েটিকে দেখে অবাক হল। হালকা-পাতলা গড়নের বাচ্চা একটি মেয়ে। শিশুদের চোখের মতো তরল চোখ। কেমন যেন অভিমানী পাতলা ঠোঁট!

আপনি বুঝি সেই টীচার? আনিস? আনিসের উত্তর দেওয়ার আগেই মেয়েটি বলল, আমি কিন্তু মাস্টারদের একটুও পছন্দ করি না। আপনি আবার রাগ করবেন না যেন।

আনিস হাসিমুখে বলল, না, আমি রাগ করব না।
মাস্টাররা ক্লাসের বাইরে কিছু জানে না। জানতে চায়ও না।

তাই কি? হ্যাঁ। আমি দশ ডলার বাজি রাখতে পারি, আপনি কবি কীটসের প্রণয়িনীর নাম জানেন না।

আনিস বেশ অবাক হল। মেয়েটির মুখ হাসি-হাসি কিন্তু ঝগড়া বাধানর একটা সূক্ষ্ম চেষ্টা আছে। শফিক তার গাড়ি নিয়ে এখনো ব্যস্ত। তার ধারণা ঝামেলাটা আসলে ট্রান্সমিশনে নয় কারবুরেটরে, আর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেই সে ঠিক করে ফেলতে পারবে।

আনিস একটি সিগারেট ধরিয়ে মৃদু স্বরে বলল, কবি কীটসের প্রণয়িনীর নাম জানা অত্যাবশ্যকীয় বিষয় নয়।

আইনস্টাইনের কয় স্ত্রী, সেটা জানা বোধ হয় অত্যাবশ্যকীয়?
না, তা নয়। এইসব হচ্ছে বিলাস।

শফিকের গাড়ি একটি ছোট গর্জন করে আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সে হাসিমুখে বলল, দেখলেন তো আনিস ভাই, প্রায় কায়দা করে ফেলেছি। আর দশ মিনিট।

আনিস সে-কথার জবাব দিল না। রুনকি মাথার স্কাযর্ক শক্ত করে বাঁধতেবাঁধতে মৃদু স্বরে বলল, আমি তর্ক করে আপনাকে রাগিয়ে দিতে চাই না। তাহলে মা খুব রাগ করবেন। মাকে আমি রাগাতে চাই না। তাঁর কিছুদিন আগেই নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল। আরেক বার হলে খুব মুশকিল হবে।

শফিকের গাড়ি স্টার্ট নিয়েছে। বিকট শব্দ আসছে সেখান থেকে। শফিক কোমরে হাত দিয়ে গাড়িকে উদ্দেশ্য করে ছোটখাট বক্তৃতা দিয়ে ফেলল, শালা তুমি মানুষ চেন নাই। কত ধানে কত চাল বুঝি নাই। শালা এক চড় দিয়ে তোমার দাঁত খুলে ফেলব...

রুনকি খিলখিল করে হেসে ফেলল।

৪. ফাইভ হানড্রেড লেভেলের একটি ক্লাস

ফাইভ হানড্রেড লেভেলের একটি ক্লাস ছিল সাড়ে দশটায়। আনিস ক্লাসে ঢুকে দেখল, চেয়ারম্যান ড. হিন্ডারবেন্ট পেছনের দিকে বসে আছে। হিন্ডারবেন্ট একা নয়, অরগ্যানিক কেমিস্ট্রির ড. বায়ারও কফির পেয়ালা হাতে বসে আছে। হিন্ডারবেন্ট বলল, আমরা তোমার ক্লাসে বসতে পারি তো?

আনিস বলল, নিশ্চয়ই।

কোনো প্রশ্ন-টশ্ন আবার জিজ্ঞেস করো না, হা হা হা।

আনিস অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। হঠাৎ করে তার ক্লাসে এসে বসার কারণ বোঝা যাচ্ছে না। তবে এরা তাকে পছন্দ করছে না, এটুকু পরিষ্কার বোঝা যায়। পছন্দ না হবার কারণ তার জানা নেই। কোনো কারণ থাকার কথাও নয়।

আনিস বক্তৃতা শুরু করল। ড. বায়ার কিছু শুনছে বলে মনে হল না। নিচু গলায় ফিসফিস করে কী-যেন বলছে হিন্ডারবেন্টকে। এক বার দু জনেই সশব্দে হেসে উঠল। হিন্ডারবেন্ট আনিসের দিকে তাকিয়ে বলল, সরি আনিস, তুমি চালিয়ে যাও। আনিস যেতে পারল না। ড. বায়ার হঠাৎ করে বললেন, তোমার ইংরেজি কথা আমি ঠিক ধরতে পারছি না, আনিস। তুমি কি আরেকটু স্লো যাবে?

তুমি তো নিজেই কথা বলছ, বায়ার। আমি স্লো বললেও কিছু যাবে-আসবে না!

দু-একটি ছেলে হেসে উঠল। হিন্ডারবেন্ট বলল, চালিয়ে যাও। তুমি চালিয়ে যাও!

আনিস দশ মিনিট আগে ক্লাস শেষ করে দিল। হিন্ডারবেন্ট উঠতে যাচ্ছিল, আনিস বলল, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে হিন্ডারবেন্ট।

বল!

আজকে হঠাৎ আমার ক্লাসে এসে বসলে কেন? পলিমার রিওলজিতে তোমার কোনো উৎসাহ আছে বলে তো শুনি নি।

হিন্ডারবেন্ট খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমরা বসেছি একটা জিনিস দেখতে। তোমার সম্পর্কে ডীনের অফিসে একটা রিপোর্ট হয়েছে। বলা হয়েছে তোমার উচ্চারণ কেউ বুঝতে পারছে না।

রিপোর্ট কি ছাত্ররা করেছে?

তা জানি না। তুমি ডীনকে জিজ্ঞেস করতে পার। আমি অবশ্যি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি তোমার কথা বুঝতে না পারার কোনো কারণ নেই।

ধন্যবাদ।

আনিস কফি খেতে গেল মেমোরিয়াল ইউনিয়নে। ড. এণ্ডারসন খাতা পত্র নিয়ে একটি টেবিল দখল করে বসেছিল। আনিসকে দেখেই গম্ভীর মুখে বলল তোমাদের বাংলাদেশের স্টল দেখে এলাম।

কী দেখে এলে?

লাইব্রেরিতে আন্তর্জাতিক একটা মেলা হচ্ছে। সেখানে তোমাদেরও একটা স্টল দেখলাম।

আনিসের মনে হল ড. এণ্ডারসন যেন হাসি গোপন করবার চেষ্টা করল।

তুমি কফি শেষ করেই যাও।

স্টলের ব্যাপারটি মিথ্যা নয়।

একটি প্রকাণ্ড টেবিল নিয়ে শফিক বসে আছে। শফিকের গায়ে একটি হাতাকাটা স্যাণ্ডো গেঞ্জি এবং পরনে সবুজ রঙের একটি লুঙ্গি। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের পোশাক। টেবিলে একটি ময়লা পাঁচ টাকার নোট, দুটি দশ পয়সা। আরেক পাশে একটি বড় ফুলস্কেপ কাগজে হলুদ মার্কার দিয়ে অ আ লেখা। আনিস স্তম্ভিত।

ব্যাপার কী শফিক?

আরো আনিস ভাই, আজকে ফর্মেসি ডিপার্টমেন্টে একটা চাকরির খোঁজে এসেছিলাম। শুনি ইন্টারন্যাশনাল উইকি হচ্ছে, বাংলাদেশের একটা কিছু না থাকলে দেশের বেইজ্জতী। আমার নিজের কাছে যা ছিল নিয়ে চলে এসেছি।

বল কী!

জিনিস কম থাকায় সুবিধা হয়েছে। দেশটা কোথায়, কী এইসব সবাই জানতে চাচ্ছে। হা হা হা। নামটা তো জানল, কী বলেন?

খালি টেবিল নিয়ে সাত দিন বসে থাকবে বুঝি?

আরে না। আজ বিকালেই রুনকিদের বাড়ি থেকে একগাদা জিনিসপত্র নিয়ে আসব দেখবেন। হুলস্থূল কারবার করব। এক মালয়েশিয়ান আমার স্টলের সামনে এসে দাঁত বের করে হাসছিল। শালার অবস্থাটা কী হয় কালকে দেখবেন। রুনকিকে নিয়ে আসব। দেশের ইজতের একটা ব্যাপার।

আনিস হাসিমুখে বলল, তোমার চাকরির কী ব্যবস্থা হবে? এই সাত দিন আর যাচ্ছে না। সেখানে?

আরে ভাই, রাখেন চাকরি। মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা এখন।

লোকজন কেউ কেউ এসে দাঁড়াচ্ছেও ঈলের সামনে। কেউ কেউ বিস্মিত হয়ে বলছে, কোন দেশের স্টল এটি?

বাংলাদেশের

কোথায় সেটি? প্যাসিফিক আইল্যাণ্ড?

না, এশিয়া মহাদেশে।

সূচিপত্র

কত বড়ো দেশ সেটি? কত স্কয়ার মাইল?

কালকে বলতে পারব। কাল আসবেন।

লোকসংখ্যা কত?

আগামীকাল জানতে পারবেন। সব লিখে টাঙিয়ে দেওয়া হবে।

আনিস দূর থেকে দেখল, লোকজন আসছে না। শফিকের ষ্টলে। তবে বুড়োবুড়িরা কিছু কিছু আসছে। তারা আবার দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শফিকের বক্তৃতা শুনছে।

দেশটা অত্যন্ত সুন্দর। সবুজ। গাঢ় সবুজ। সমুদ্র আর নদী। বনে ঘুরে বেড়ায় ইয়া ইয়া রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আগামী কাল যদি আসেন, তবে সেই রয়েল বেঙ্গলের ছবিও দেখতে পাবেন! দয়া করে আসবেন। ভুলবেন না।

৫. শফিকের কাণ্ডকারখানা

শফিকের কাণ্ডকারখানাই অন্য রকম।

পাঁচটা ডলার পকেটে নিয়ে ফার্গোতে এসে এক মাসের মধ্যে দু শ চল্লিশ ডলার দিয়ে গাড়ি কিনে ফেলল। আমিন সাহেব খবর পেয়ে বিরক্ত হলেন খুব, গাড়ি কিনলে, গাড়ির দরকারটা কী তোমার?

শফিক মাথা চুলকে বলেছে, দেশের সম্মানের জন্যেই কাজটা করলাম।

দেশের সম্মান! দেশের সম্মান মানে?

গরিব দেশ গরিব দেশ করে তো, বুঝলেন না! শালাদের দেখিয়ে দিলাম আর কি।

তোমার দুই শ ডলারের গাড়ি দিয়ে ওদের দেখিয়ে দিলে? চালাতে জান গাড়ি?

শিখব।

এখানেই শেষ নয়, আর্টসের ছাত্র কীভাবে সায়েন্সের কবিনেশনে চার-পাঁচটা সাবজেক্ট নিয়ে ফেলল। আমেরিকায় এসে ইতিহাস-ভূগোল পড়ে লাভটা কী? পড়তে হলে পড়তে হয় ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কম্প্যুটার সায়েন্স।

মিডটার্মের রেজাল্ট হওয়ার পর ফরেন স্টুডেন্ট এ্যাডভাইজার টয়লা ক্লিন ডেকে পাঠালেন শফিককে। রেজাল্ট ভয়াবহ; তিনটি ডি এবং একটি সি।

শফিক, তোমার দেশ কোথায়?

শফিক গম্ভীর হয়ে বলল, ইণ্ডিয়া ম্যাডাম! ক্যালকাটা সিটি।

টয়লা ক্লিন কাগজপত্র ঘেটে শফিকের চেয়েও গম্ভীর হয়ে বললেন, কিন্তু আমার কাছে যেসব কাগজপত্র আছে, সেখানে লেখা বাংলাদেশ।

শফিক মাথা চুলকায়, জবাব দেয় না। তুমি কি দয়া করে ব্যাপারটা আমার কাছে এক্সপ্লেইন করবে?

রেজাল্ট যা হয়েছে ম্যাডাম এতে দেশের একটা বদনাম হয়ে যায়, এই জন্যেই বলি ইণ্ডিয়া।

টয়লা ক্লিনের গাম্ভীর্য মনে হয় খসে পড়ছে। ঠোঁটের কোণায় মৃদু হাসি।

তোমার দেশের সব ছাত্র বুঝি এ পায়? ম্যাডাম, আমার দেশের ছাত্ররা সব বাঘের বাচ্চা। যে-কোনো আমেরিকান স্ট্রেইট এ ছেলেমেয়েদের এরা কুৎ করে পানি দিয়ে গিলে ফেলবে।

তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

অর্থাৎ এরা খুব মারাত্মক। একেবারে গ্রীন পিপার।

টয়লা ক্লিন বলে দিলেন, ফাইন্যালে যে-করেই হোক এভারেজ সি থাকতেই হবে। জিপিএ ২ এর কম হলে ভিসা রিনিউ হবে না, দেশে ফিরে যেতে হবে।

বাইরে দিনে ছয়-সাত ঘণ্টা কাজ করে পড়ারই সময় পাই না, ম্যাডাম।

কোথায় কাজ কর তুমি?

নিক্স প্লেসে। বিয়ার বিক্রি হয় সেখানে।

চার দিন পর শফিকের কাছে টয়লা ক্লিনের এক চিঠি এসে হাজির।

প্রতি ঘণ্টায় মিনিমাম ওয়েজ তিন ডলার পঞ্চাশ সেন্ট করে তোমাকে লাইব্রেরিতে একটি কাজ দেয়া হল। এখন পড়াশোনার ভালো সুযোগ পাবে।

লাভ কিছু হল না। ফাইন্যালে দেখা গেল চারটেই ডি। টয়লা ক্লিন ভ্রূ কুচকে বলল, এখন কী করবে?

গভীর সমুদ্রে ম্যাডাম। বিষ খাওয়া ছাড়া উপায় নাই কিছু।

আরেকটা কোয়ার্টারের সুযোগ যাতে দেয় এই চেষ্টা করব? প্রথম দিকে কিছু সহজ কোর্স নিলে কেমন হয়?

শফিককে দ্বিতীয় কোয়ার্টারের সুযোগ দেওয়া হল। ডীনের অফিস থেকে পার্মিশনের জন্যে টয়লা ক্লিনকে প্রচুর দৌড়াদৌড়ি করতে হল। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে হল দুটি ডি এবং একটি সি, ও একটি এফ। টয়লা ক্লিন গম্ভীর হয়ে বলল, এই ইউনিভার্সিটিতে তুমি আর পড়তে পারছ না শফিক। কী করবে এখন? দেশে ফিরে যাবে?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

না।

ইল্লিগেল এ্যালিয়েন হিসাবে থাকবে?

হ্যাঁ।

টয়লা ক্লিন শান্ত স্বরে বলল, গুড লাক। আমেরিকা হচ্ছে ল্যাণ্ড অব অপারচুনিটি। কিছু একটা হয়েও যেতে পারে তোমার।

শফিক গ্রেভার ইনের কাছে একটা ঘর ভাড়া করে নিক্স প্লেসের কাজে লেগে গেল।

নিক্স প্লেস যে-মহিলাটি চালায় তার নাম জোসেফাইন নিক্স। লম্বায় চার ফুট তিন ইঞ্চি। দৈর্ঘ্যের স্বল্পতা সে অবশ্যি পুষিয়ে নিয়েছে ওজন দিয়ে। বর্তমান ওজন ২৩০ পাউণ্ড। সে-ওজনও প্রতি সপ্তাহে বাড়ছে। গায়ের রঙ ঘন কৃষ্ণবর্ণ। গত ছয় পুরুষ ধরে আমেরিকায় বাস করেও আফ্রিকার আদিম বর্ণের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। শফিককে চাকরি দেবার সময় সে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, তোমাকে চাকরি দিচ্ছি একটি মাত্র কারণে, তোমার গায়ের রং কালো। সাদা মানুষগুলিকে ঈশ্বর বিষ্ঠা দিয়ে তৈরি করেছেন। সাদা মানুষের রক্তের মধ্যে একটা জিনিসই আছে, সেটা কী জান?

না।

বিষ। আসল হেমলক বিষ। পৃথিবীতে যত অন্যায় অবিচার হয়েছে, সব করেছে সাদা মানুষ।

তাই কি?

একদম খাঁটি কথা। আমার এখানে সাদা মানুষ ঢুকলে পাছায় লাথি দিয়ে বের করে দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তা দেওয়া যায় না। কারণ ফেডারেল আইনে সাদা এবং কালোর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই। কি কুৎসিত আইন। সাদা কখনো কালোর সমান হয়?

জোসেফাইনের এখানে একটি সাদা ছেলেও কাজ করে। কিন্তু তাতে জোসেফাইনের কিছুই যায় আসে না। চক্ষু-লজ্জাটজ্জা বলে তার কাছে কিছু নেই।

সাদা মানুষদের মুণ্ডপাত না করে সে তার দিন শুরু করে না।

হ্যারি (জোসেফাইনের স্বামী) যে আজ জেলে খাবি খাচ্ছে, সে কিসের জন্যে? কী কারণে? একটি মাত্র কারণ, জজ সাহেব ছিল সাদা। জুরীরা ছিল সাদা। যে পুলিশ ধরেছে, সেও ছিল সাদা। এই অবস্থায় হ্যারির বিশ বছরের জেল হবে না তো কার হবে? ইলেকট্রিক চেয়ারে নিয়ে যে বসায় নি, সে আমার উপর মাদার মেরীর অসীম করুণা আছে বলেই।

হ্যারির অভাবে জোসেফাইন যে খুব কাতর, সে-রকম মনে করারও কোনো কারণ নেই। দিনের মধ্যে দু এক বার সে বলবেই যীশু খ্রিষ্ট্রের দয়া, হ্যারি এখন জেলে। বাইরে থাকলে নিক্স প্লেসের অর্ধেক বিয়ার সেই খেয়ে ফেলত। এখন ভালো হয়েছে জেলে বসে আঙুল চুষছে।

কাস্টমারদের সঙ্গে নিত্যদিন খিটিমিটি লেগে আছে। কেউ হয়তো বলল, ব্লাডি মেরীতে জল মনে হচ্ছে বেশি হয়ে যাচ্ছে জোসেফাইন।

বেশি হলে খেও না, তোমাকে পায়ে ধরে সাধছি?

পয়সা দিচ্ছি, ঠিক জিনিস খাব। পানি-মেশান ব্লাডি মেরী খাব কেন?

আলবত খাবে। তুমি একা নও, তোমার চোদ্দগুষ্টি খাবে।

টাকা-পয়সা নিয়েও শফিকের সঙ্গে তার খিটমিটি লেগেই আছে। ঘণ্টায় দু ডলারের বেশি কিছুতেই দেবে না। পোষালে কাজ কর, না-পোষালে করবে না। দশ ঘণ্টা কাজ করলে সে হিসাব করে বের করে সাত ঘণ্টা কাজ হয়েছে। তার বড়ো মেয়ে এ্যালেনকে নিয়েও তার আদিখ্যেতার অন্ত নেই। সুযোগ পেলেই গলা নিচু করে বলবে, খবর্দার, কোনো রকম ফষ্টিনষ্টির চেষ্টা করবে না। আমার মেয়েটা খারাপ। একটু ইশারা করলেই সর্বনাশ। আমি যদি দেখি এইসব কিছু হচ্ছে, তাহলে খুন করে ফেলব, হুঁ-হুঁ!

এ্যালেন নিজেও তার মায়ের মতো তিন-মণী বস্তা। তাকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করার ইচ্ছা হবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু মেয়ের মা তা বোঝে না।

মেয়েটির স্বভাব-চরিত্র অবশ্যি সত্যি সত্যি ভালো নয়। আড়ালে পেলেই শফিকের সঙ্গে কুৎসিত সব অঙ্গভঙ্গি করে। একদিন বেশ ভালোমানুষের মতো শফিককে মুভি দেখাতে নিয়ে গেল। মুভি দেখাবার এত সাধ্যসাধনার কারণ জানা গেল মুভি শুরু হবার পর। হার্ড

কোর পণো মুভি একটি। মেয়েটি মেঘস্বরে বল, সব কায়দা-কানুন যাতে শিখতে পোর, সে জন্যেই নিয়ে এলাম। অনেক কিছু জানার আছে।

৬. টুকটুক করে টোকা পড়ছে

টুকটুক করে টোকা পড়ছে দরজায়। তার মানে যে এসেছে সে পরিচিত কেউ নয়। পরিচিতরা ডোরবেল বাজায়। ডোরবেলটি এমন জায়গায় যে অচেনা কারোর চোখে পড়ে না।

আনিসের মনে হল যে এসেছে সে এক জন মহিলা। শুধুমাত্র মেয়েরাই দরজায় দু বার টোকা দিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তৃতীয় বার টোকা দেয়। ছেলেদের এত ধৈর্য নেই।

আনিস দরজা খুলে দিল। একটি মেয়েই দাঁড়িয়ে আছে, মালিশা। দিনের আলোয় তাকে একেবারেই চেনা যাচ্ছে না। তার উপর সে বেশ সাজগোজ করেছে। কাঁধে লাল টকটকে ভেলভেটের ব্যাগ। সোনালি চুলগুলিকে লম্বা বেণী করে কাঁধের দু পাশে ঝুলিয়ে দিয়েছে। রাতের আলোয় যতটা অল্পবয়েসী মনে হয়েছিল, এখন অবশ্যি সে-রকম লাগছে না।

তুমি কি আমাকে চিনতে পারছি?

তা পারছি। তুমি মালিশ। মালিশা গিলবার্ড।

আমি কি তেতিরে এসে বসতে পারি?

হ্যাঁ, পার!

মেয়েটি ঘরে ঢুকেই বলল, তুমি সন্ধ্যাবেলা ফ্রী আছ?

কেন বল তো?

আমি তোমাকে কোনো একটি ভালো রেস্টুরেন্ট নিয়ে যেতে চাই। আজ আমার জন্মদিন।

শুভ জন্মদিন মালিশা।

ধন্যবাদ। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে?

আনিস ইতস্তত করতে লাগল।

তোমার ইচ্ছা না হলে যেতে হবে না।

আনিস বলল, কোথায় যেতে চাও?

আমার পকেটে চল্লিশ ডলার আছে। এর মধ্যে হয়, এরকম কোনো রেস্টুরেন্ট। মেক্সিকান খাবার তোমার পছন্দ হয়? সেগুলি বেশ সস্তা।

মেক্সিকান খাবার আমার খুব পছন্দ।

তোমাকে খুব একটা ভালো রেস্টুরেন্টে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল আমার। কিন্তু কী করব বল? রোজগারপাতি নেই। হাইস্কুল পাস করি নি। কাজেই রেস্টুরেন্টের ওয়েটেস আর বেবিসিটিং-এর বেশি কিছু পাই না। চল্লিশ ডলার জমাতে হলে আমাকে দু মাস রোজ আট ঘণ্টা করে কাজ করতে হয়।

আনিস বলল, তুমি যদি কিছু মনে না কর, তাহলে আমি বরং ডিনারটা কিনি।

মালিশা হেসে ফেলল।

এখন আমার অবস্থা খুবই খারাপ। কিন্তু শিগগিরই আমি মাল্টিমিলিওনিয়ার হচ্ছি। কাজেই টাকা খরচ করতে মায়া লাগে না আমার।

আনিস বলল, মিলিওনিয়ার সত্যি সত্যি হচ্ছে তুমি?

ইউ বেট। আমার মা ডলারের বস্তার উপর শুয়ে আছে। আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে, যদি বিষটিষ খাইয়ে দিই। আমিও বুড়িকে ভজিয়ে রাখছি। প্রতি সপ্তাহে চিঠি দিই–মা, তোমার শরীর কেমন আছে? ঠিকমতো ওষুধপত্র খাচ্ছ তো? গরমের সময় অবশ্যই হাওয়াই থেকে ঘুরে আসবে। হা হা হা।

আনিস হেসে ফেলল। মালিশ বলল, বুড়ো—বুড়ি হলেই মানুষ এরকম হয়ে যায়। ডলারই তখন প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। জীবন দিয়ে ডলার আগলে রাখে। আমার মতে পঞ্চাশের ওপর বয়স হলেই তাকে ঘাড় ধরে একটা নির্জন দ্বীপে ফেলে দিয়ে আসা উচিত। না-না, আমি খুব সিরিয়াস। জান তুমি, আমার মারা কত টাকা আছে? আন্দাজ করতে পারে?

না।

মা দু নম্বর বিয়ে করে এক জন পোল ব্যবসায়ীকে। তার হচ্ছে সী কার্গোর ব্যবসা। আমার স্টেপফাদার মারা যাবার পর সবকিছু আমার মা পেয়েছে। তার মধ্যে আছে রাজপ্রসাদের

মতো দুটি বাড়ি। একটি ফ্লোরিডাতে, অন্যটি বোহেমিয়া আইল্যাণ্ডে। মা সবকিছু বিক্রি করে ডলার বানিয়ে ব্যাঙ্কে জমা করেছে। নিজে গিয়ে উঠেছে ওল্ড হোমে। সস্তায় থাকা-খাওয়া যায়। বিশ্বাস করতে পার?

বিশ্বাস করা কঠিন।

আমি তারই মেয়ে। আর দেখ, চল্লিশটি ডলার খরচ করতে আমার গায়ে লাগছে।

আনিস দেখল, মেয়েটির চোখ ছলছল করছে। আমেরিকান মেয়ে কাঁদবে না ঠিকই। এরা মাচকাতে জানে না।

আনিস বলল, ছটার আগে নিশ্চয়ই তুমি খেতে যাবে না? কফি খাও একটু!

কফিতে দুধ চিনি নাও তুমি?

দু চামচ চিনি। দুধ চাই না।

আনিস কফি বানাতে বানাতে বলল, মিলিওনিয়ার যখন হবে, তখন এত টাকা খরচ করবে কীভাবে?

প্রথমেই প্লাস্টিক সার্জারি করব। আমার বুক দুটি বড়োই ছোট। সিলিকোন রাগ দিয়ে বড়ো করব। আমাকে দেখে অবশ্যি বোঝা যায় না, আমার বুক এত ছোট। আমি অন্য ধরনের ব্রা ব্যবহার করি। ফোম ব্রা।

ও আচ্ছা।

এই ব্রাতে ছোট বুকও খুব এটাকটিভ মনে হয়। ব্রা খুললেই তুমি হতাশ হবে। দেখতে চাও?

না, না ঠিক আছে, বিশ্বাস হচ্ছে তোমার কথা।

তাছাড়া আমার নাকটাও বেশি ভালো না। মনে হয় অনেকখানি ঝুলো আছে। তাই না?

আমার তো মনে হয় না।

তোমার সৌন্দর্যবোধ নেই, তাই বুঝতে পারছি না।–নাকটা অল্প একটু তুলে দিলেই সব বদলে যাবে।

কেমন বদলাবে?

যেমন ধর, তখন যদি তোমাকে বলি–ব্রা খুললেই দেখবে আমার বুক দুটি টাইনি, তুমি দেখতে চাও? তুমি বলবে–তাই নাকি? কই দেখি তো?

আনিস খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মালিশা, তুমি বেশ বুদ্ধিমতী!

আমার মায়েরও তাই ধারণা। মা বলেন–বুড়ো বয়সে কোনো ধনী মহিলার উচিত নয় তার মেয়েকে কাছে রাখা, বিশেষ করে সে মেয়ে যদি আমার মতো ইন্টেলিজেন্ট হয়।

কফি কেমন হয়েছে মালিশা?

ভালো।

আরেক কাপ নেবে?

দাও। তোমার নাম কিন্তু আমি জানি না।

আনিস।

তুমি কি ইণ্ডিয়ান?

না, বাংলাদেশ হচ্ছে আমার দেশ।

সেটা আবার কোথায়?

ইণ্ডিয়ার পাশে ছোট একটা দেশ।

সেখানেও কি ইণ্ডিয়ার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ থালা হাতে খাবারের জন্যে ঘুরে বেড়ায়?

কোথায় শুনেছ এসব?

আগে বল সত্যি কিনা। ডাস্টবিনের পাশে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা বসে। থাকে।–কখন কেউ এসে খাবার ফেলবে সেই আশায়। বল, সত্যি নয়? নাকি তোমার স্বীকার করতে লজ্জা লাগছে?

আনিস ইতস্তত করে বলল, সত্যি নয়। বড়ো বড়ো অভাব হয়েছে। সে তো পৃথিবীর সব দেশেই হয়েছে। ইউরোপে হয় নি? আমেরিকাতেও তো ডিপ্রেসন হয়েছে।

আনিস, তুমি রেগে যাও কেন? তোমাকে রাগাবার জন্যে আমি বলি নি।

তোমরা যা ভাব, দেশটি মোটেই সে-রকম নয়।

মালিশা ঠোঁট চেপে হাসল। পরমুহুর্তে ভালোমানুষের মতো বলল, ইলেকট্রিসিটি আছে?

এসব জিজ্ঞেস করছ কেন?

কারণ, জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। বলতে ইচ্ছা না হলে বলবে না।

আনিস গম্ভীর মুখে বলল, না মালিশা, ইলেকট্রিসিটি-ফিটি নেই। গাড়ি ফাড়িও নেই। শহরে বাস সার্ভিসের বদলে আছে এলিফ্যান্ট সার্ভিস। হাতির পিঠে চড়ে যাওয়া-আসা।

ঠাট্টা করছ?

তা করছি।

কেউ আমার সঙ্গে ঠাট্টা করলে আমার ভালো লাগে না। প্লীজ, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করবে না এবং আমি সরি।

সরি কী জন্যে?

তোমাদের দেশের কথা বলে হার্ট করেছি, সেই জন্যে। আমার যখন টাকা হবে, তখন আমি তোমার দেশ দেখতে যাব।

বেশ তো।

দেশে তোমার কি বউ আছে?

না।

কোনো সুইটহার্ট?

না, তাও নেই।

আমি মনে মনে আশা করছিলাম, তুমি বলবে না। বিবাহিত লোকদের আমার ভালো লাগে না।

টুনটুন করে ঘণ্টা বাজছে। যে এসেছে, সে যদিও ডোরবেল বাজাচ্ছে, তবু লোকটি অপরিচিত। এরকম করে ঘণ্টা কেউ বাজায় না। ছোট বাচ্চাদের মতো অনবরত টিপেই যাচ্ছে! আনিস দরজা খুলে অবাক হয়ে গেল। নিশানাথ বাবু।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

নিশানাথ বাবু ঢুকেই মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন, এই মেয়েটি বড়ো সুন্দর তো! দূর্গা প্রতিমার মতো চোখ।

মালিশা বলল, আপনি কি আমাকে নিয়ে কিছু বলছেন? আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন, তাই জিজ্ঞেস করছি।

নিশানাথ বাবু হাসিমুখে বললেন, আমি বলছি এই মেয়েটি কে? আমাদের এক গডেস-এর চোখের মতো অপূর্ব চোখ!

মালিশা হাসিমুখে বলল, আমার নাম মালিশা। আজ আমার জন্মদিন। জন্মদিন উপলক্ষে আপনি কি আমার সঙ্গে দয়া করে ডিনার খাবেন?

খাব না কেন?

নিশানাথ বাবুর ভাব দেখে মনে হল, তিনি খুব অবাক হয়েছেন প্রশ্ন শুনে।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার সঙ্গে কিন্তু মাত্র চল্লিশ ডলার আছে। মেক্সিকান রেস্টুরেন্টে গেলে মনে হয়। এতেই তিন জনের হয়ে যাবে, কি বলেন?

টেকো খেতে আর কয় পয়সা লাগবে? হয়েও থাকবে, দেখবে।

নিশানাথ বাবু ঠিকানা যোগাড় করে কী জন্যে হঠাৎ এসেছেন, আনিস বুঝতে পারল না। নিশানাথ বাবু ফার্গোতে এসেছিলেন বাংলাদেশের স্টল দেখতে। সেখান থেকে আনিসের

কাছে এসেছেন। কারণ রেহানা বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন আনিসের ঘর হয়ে আসতে। হঠাৎ করে আনিসের সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে কেন, নিশানাথ বাবু বুঝতে পারেন নি। অনেক কিছুই তিনি বুঝতে পারেন না। আসতে বলা হয়েছে, তিনি এসেছেন। ব্যস।

আনিস বলল, বাংলাদেশের স্টল কেমন দেখলেন?

চমৎকার। ঐ টম ছোকরা কী সব কায়দাকানুন করে দিয়েছে, আমি স্তম্ভিত। টেবিলটাতে হার্ডবোর্ড-ফোর্ড লাগিয়ে রং-টাং দিয়ে এমন করেছে, দেখে মনে হয় একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ছোকরার গুণ আছে।

মালিশা অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, আপনার নামটা কি দয়া করে বলবেন?

আমার নাম নিশানাথ।

এই নামের মানে কি?

এর মানে হল গড অব দ্য ডার্কনেস।

বাহ্, মজার নাম তো!

নিশানাথ বাবু সিগারেট ধরিয়ে বললেন, ঐ টম ছোকরার গুণ আছে। হুলস্থূল করছে, বুঝলেন নাকি আনিস সাহেব। পেছনে হার্ডবোর্ডের উপর বৃষ্টির ছবি এঁকেছে। ছবির দিকে তাকালেই বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনা যায়। মনে হয় ব্যাঙ ডাকছে চারদিকে।

মলিশা বলল, ব্যাঙ ডাকছে মানে?

আমাদের দেশে বৃষ্টি হলেই ব্যাঙ ডাকে। সেই শব্দ জগতের মধুরতম ধ্বনির একটি। তুমি না শুনলে বুঝতে পারবে না।

ব্যাঙের ডাক তো আমি শুনেছি। ওর মধ্যে মধুরতর কী আছে? এই সব আপনি কী বলছেন?

মালিশা, তোমাকে বোঝান যাবে না।

নিশানাথ বাবু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। মালিশা অবাক হয়ে বলল, আপনি অদ্ভুত লোক! সত্যি অদ্ভুত!

মালিশার বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হল।

মেটোপলিটন বাসে উঠতে গিয়ে দেখে একটার উপর বাজে। ফাঁকা বাস। সে ছাড়া অন্য কেউ নেই। একটি নব্বুই বছরের বুড়ি ছিল, সে টুয়েলভ স্ট্রীটে নেমে গেল। নামবার সময় বুড়িটি বলল, আমাকে একটু হাত ধরে নামিয়ে দেবো?

মালিশা এমন ভাব করল, যেন সে শুনতে পায় নি! বুড়ি দ্বিতীয় বার কিছু না বলে নিজে নিজেই নামল। এই বয়সেও রাতদুপুরে একা-একা বাসে চড়া চাই। খোঁজ নিলে দেখা যাবে পাসবই-ভর্তি ডলার। তবু পাঁচ ডলার খরচ করে ক্যাব ডাকবে না। দেশে একটা ফেডারেল

আইন থাকা দরকার, যে-আইনে সত্তুরের উপর বয়স হলে সব টাকা-পয়সা সরকারের কাছে সারেণ্ডার করে নির্বাসনে যেতে হয়।

বাস ডাউনটাউনে আসতেই মালিশা নেমে গেল। এখানে বাস বদল করতে হবে। বাস থেকেই মালিশ লক্ষ করল তার হাত-পা শিরশির করছে। নির্ঘাত আবার জ্বর আসছে। এ রকম হচ্ছে কেন? বারবার শরীর খারাপ হচ্ছে। মালিশ মাথা নিচু করে দ্রুত হাঁটতে লাগল। শরীর বেশি খারাপ হবার আগেই এ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাওয়া দরকার।

বাস-স্ট্যাণ্ডটি ফার্স্ট এ্যাভিন্যুতে। মালিশার ইচ্ছে হল, বাসের জন্যে না হেঁটে একটি ক্যাব ডাকে। সে খোলা একটি ট্যাভার্ণে ঢুকে পড়ল। ক্যাব কোম্পানিকে টেলিফোন করতে হবে।

জন টিভিলটার রেকর্ড বাজছে উচ্চ স্বরে। কোমর জড়াজড়ি করে ডায়াসের কাছে দু-তিনটে ছেলেমেয়ে নাচছে। সেদিকে তাকিয়ে মালিশার কেমন যেন মাথা ঘুরতে লাগল।

হ্যালো মালিশা, গা গরম করবে নাকি? নাচবে এক পাক?

মালিশ তাকাল, কিন্তু ছেলেটিকে চিনতে পারল না।

মালিশা, এস।

নাহ।

না কেন?

আমার শরীর ভালো লাগছে না।

মলিশ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাল। চিনতে পারছে না কেন? ছেলেটি এসে পরিচিত ভঙ্গিতে হাত ধরল। গলার স্বর নামিয়ে বলল, যাবে না কি আমার সঙ্গে?

কোথায়?

আমার এ্যাপার্টমেন্ট। দু জনের ছোটখাটো একটা পার্টি হয়ে যাবে, কী বল?

না।

না কেন? আসি। আমি তো অপরিচিত কেউ নই। আগেও তো আমাক সঙ্গে ডেটে গিয়েছ। এস এস, খুব ফান হবে।

৭. ছ ফুট লম্বা টম

রাহেলা দরজা খুলে দেখতে পেলেন ছ ফুট লম্বা টম দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার সারা মুখে দাঁড়িগোঁফের জঙ্গল। খালি গা। পরনে জিনিসের একটি হাফপ্যান্ট!

পায়ে জুতোটুতো কিছুই নেই।

আমি রুনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

কার সঙ্গে?

রুন, রুনকি।

রাহেলা এক বার ভাবলেন বলেন রুনকি বাড়ি নেই। কোথায় গেছে জানি না। কিন্তু বলতে পারলেন না। টম ভারি গলায় বলল, তুমি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারছ না। আমার নাম টমাস গ্রে। আমি রুনের বন্ধু।

ভেতরে এসে বস, আমি ডেকে দিচ্ছি।

না, আমি ভেতরে এসে তোমার কার্পেট নোংরা করব না। পায়ে আমার প্রচুর ময়লা।

রাহেলা রুনকির ঘরে উঁকি দিলেন। রুনকি চুল ছেড়ে চুপচাপ বসে আছে। হালকা সুরে পোলকা মিউজিক বাজছে। রুনকির সামনে গাদাখানিক বইপত্র ছড়ান। রাহেলা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে ডাকলেন, রুনকি?

ভেতরে এস, মা।

রুনকি, তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

রুনকি হাসিমুখে বলল, কথা বলতে চাইলে বল। এত গম্ভীর হয়ে আছ কেন?

রাহেলা থেমে থেমে বললেন, আমরা তোমাকে ভালোবাসি এবং তোমার মঙ্গল চাই–এই সম্পর্কে তোমার কোনো সন্দেহ আছে?

আছে।

রাহেলা মুখ কালো করে বললেন, আমি তা জানতাম না।

ঠাট্টা করছিলাম মা। তুমি ঠাট্টা বুঝতে পার না, এ তো বড়ো মুশকিল।

রাহেলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি চাই না, তুমি টমের সঙ্গে মেলামেশা কর।

রুনকি খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, টম কি এসেছে?

রাহেলা উত্তর দিলেন না। রুনকি ঝড়ের বেগে নিচে নেমে গেল। রাহেলারও ইচ্ছা হল নিচে নামেন। কিন্তু নামলেন না। নামলেই হয়তো দেখবেন দু জন জড়াজাড় করে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘদিন আমেরিকায় বাস করার পরও এই দৃশ্য তাঁর ভালো লাগে না। রাহেলা মন্থর পায়ে নিজ ঘরের দিকে এগোলেন। তার কিছুক্ষণ পর রুনকি আবার উপরে উঠে

এল। নিজের ঘরে বসেই রাহেলা বুঝতে পারলেন রুনকি সাজগোজ করছে। হালকা সুরে শিস দিচ্ছে। মেয়েদের শিস দেয়া একটা কুৎসিত ব্যাপার।

সেই রাত্রে রুনকি আর বাড়ি ফিরল না।

৮. ক্লাস থেকে বেরুনমাত্র

ক্লাস থেকে বেরুনমাত্র এণ্ডারসনের সঙ্গে দেখা। এণ্ডারসন লোকটি ফুর্তিবাজ। দেখা হলেই একটা মজাদার কথা বলবে কিংবা জিভ বের করে ভেংচে দেবে। কে বলবে সে হেটারোসাইক্লিক কম্পাউণ্ডের এক জন বিশেষজ্ঞ–এক জন ফুল প্রফেসর।

আনিস বলল, হ্যালো এ্যাণ্ডারসন।

এ্যাণ্ডারসন একটি চোখ বন্ধ করে অন্য চোখ পিটপিট করতে লাগল। আনিস হেসে ফেলতেই সে বলল, তোমার সঙ্গে কথা আছে আনিস। এস, কফি খেতেখেতে বলব।

কফি হাউসে তিলধারণের জায়গা নেই। ফাইন্যাল এগিয়ে আসছে। ছেলেমেয়েরা বইখাতা নিয়ে ভিড় জমাচ্ছে হাউসে, কেউ টেবিল ছাড়ছে না। খুপরি ঘরগুলির একটিতে জায়গা পাওয়া গেল মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে থাকার পর। আনিস বলল, কী বলবে বল।

ইদানীং কি তুমি অল্পবয়সী একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

আনিস অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কি জন্যে জিজ্ঞেস করছ?

কারণ আছে। আমেরিকা একটি ফ্রী কান্ট্রি। তুমি কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটি প্রবলেম হয়েছে।

কী প্রবলেম?

এ্যাণ্ডারসন গম্ভীর মুখে বলল, মেয়েটি একটি প্রসটিটিউট।

আনিস চুপ করে রইল। এ্যাণ্ডারসন আবার বলল, তুমি প্রসটিটিউটের সঙ্গে ঘুরলেও কিছু যায় আসে না। কিন্তু মাঝেমাঝে বড়ো রকমের ঝামেলা হয়। হঠাৎ এক দিন হয়তো মেয়েটি তোমাকে এসে বলবে, আমার পেটে তোমার বাচ্ছা! এবরশনের জন্যে হাজার দশেক ডলার দরকার।

আনিস গম্ভীর মুখে বলল, জানলে কী করে, মেয়েটি একটি প্রসটিটিউট?

আমি জানি। মেয়েটির নাম নিশ্চয়ই মালিশা। ঠিক না?

আনিসা জবাব দিল না।

জোসেফাইন পঞ্চম বারের মতো শফিকের চাকরি নট করে দিল।

তোমার মতো মিনমিনে শয়তান, ফাজিল আর অকর্মাকে ছাড়াও আমার চলবে। শুক্রবারে এসে পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেবে।

বুড়ির রেগে যাওয়ার কারণ, শফিক এক জন কাস্টমারের নাকে গদাম করে ঘুষি মেরেছে। বেচারার দোষ হচ্ছে, সে নাকি শফিকের দেশ বাংলাদেশ শুনে কোমরে হাত দিয়ে হায়নার মতো হেসেছে। জোসেফাইন চোখ লাল করে বলেছে, হেসেছে বলেই ঘুষি মারবো? খুশি হয়ে বেচারা হেসেছে।

খুশি হয়ে হেসেছে মানে? এই হাসি খুশি হওয়ার হাসি?

কিসের হাসি সেটা? বল তুমি কিসের হাসি?

কিসের যে হাসি তা অবশ্যি শফিকও জানে না। হয়তো বিনা কারণে হোসেছে। কিন্তু শফিকের মেজাজ সকাল থেকেই খারাপ যাচ্ছিল। সকালবেলাতেই খবর পাওয়া গেছে জেমসটাউনের রকিবউদ্দিন একটি রেস্টুরেন্ট দিচ্ছে। মন খারাপ করার মতো খবর নয়। কিন্তু রেস্টুরেন্টের নাম দিয়েছে ইণ্ডিয়া হাউস। শফিককে টেলিফোন করে বলল, বাংলাদেশের নাম তো কেউ জানে না। কিন্তু ইণ্ডিয়ান ফুডের নাম জগৎজোড়া, কাজেই নাম দিলাম ইণ্ডিয়া হাউস। আপনি ভাই ফার্গোর সব বাঙালিদের খবর দেবেন। ইনশাআল্লাহু আগামী মাসেই খুলব।

শফিক মেঘস্বরে বলল, ইণ্ডিয়া হাউস নাম দিয়েছেন?

এখনো ফাইন্যাল করি নি। ইণ্ডিয়া ফুডস-ও দিতে পারি।

অর্থাৎ ইণ্ডিয়া থাকবেই?

হ্যাঁ, তা তো থাকতেই হবে।

শোনেন ভাই, আপনাকে যদি আমি ফার্গোতে দেখি, তাহলে আপনাকে আমি খুন করে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসব, বুঝেছেন?

আপনি কী বলছেন, বুঝতে পারছি না।

চুপ শালা।

শফিক টেলিফোন রেখে নিক্স প্লেসে এসেই কাস্টমারের নাকে ঘুষি বসাল। জোসেফাইন এবার সত্যি সত্যি রেগেছে। এ পর্যন্ত তিন বার বলেছে।

শফিক তোমাকে যেন আর না দেখি। যথেষ্ট হয়েছে।

শফিক নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখে, ইমিগ্রেশন থেকে চিঠি এসেছে সে যেন চিঠি পাওয়ার সাত দিনের ভেতর ইমিগ্রেশন এ্যাণ্ড ন্যাচারলাইজেশন অফিসার টি, রবার্টসনের সঙ্গে দেখা করে।

শফিককে এ নিয়ে খুব চিন্তিত মনে হল না। তার মাথায় ঘুরছে, কী করে হারামজাদা রহমানকে একটা উচিত শিক্ষা দেওয়া যায়। একটা বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট দিয়ে ফেললে কেমন হয়? খুব কি কঠিন ব্যাপার? নাম দেওয়া যেতে পারে দি মেঘনা-এ প্লেস ফর এক্সোটিক বাংলাদেশী ফুড। কিন্তু ফুড কি এক্সোটিক হবে? শব্দটা ঠিক আছে নাকি? এইসব ব্যাপারে রুনকি এক জন ছোটখাটো বিশেষজ্ঞ। শফিক টেলিফোন করল তৎক্ষণাৎ। টেলিফোন ধরলেন রাহেলা।

আমি শফিক।

বুঝতে পারছি। কী ব্যাপার?

খালা, আমরা একটা রেস্টুরেন্ট দিচ্ছি, নাম হচ্ছে আপনার–দি মেঘনা।

কী দিচ্ছ?

রেস্টুরেন্ট। বাংলাদেশী সব খাবারটাবার পাওয়া যাবে। আজ সন্ধ্যায় বাসায় এসে সব আলাপ করব। রাহেলা গম্ভীর গলায় বললেন, সন্ধ্যাবেলা আমরা থাকব না।

ও আচ্ছা, রুনর্কিকে একটু দিন। ওর সঙ্গে কথা বলি।

রুনকি তো নেই।

নেই মানে?

রাহেলা থেমে থেমে বললেন, তুমি কি কিছু জান না?

না, কী জানব?

রুনকি এখন আর আমাদের সঙ্গে থাকে না।

কোথায় থাকে তাহলে?

রাহেলা ঠাণ্ডা স্বরে বললেন, আমি জানি না কোথায় থাকে।

শফিক অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, কই, আমাকে তো কিছু বলেন নি।

তোমাকে বলতে হবে কেন? তুমি কে?

রাহেলা টেলিফোন নামিয়ে রেখে ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠলেন। এই শহরে আর থাকতে পারবেন না। অনেক দূরে চলে যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে যেতে হবে আড়ালে, যাতে কেউ কখনো রুনকির খোঁজে টেলিফোন করতে না পারে।

৯. রুনকি এন্ড টম

রুনকি গিয়ে উঠেছে টমের ওখানে।

দুটি অবিবাহিত ছেলেমেয়ের একসঙ্গে বাস করা এমন কিছু অবাক হওয়ার মতো ঘটনা নয়। বিয়ের মতো এমন একটি প্রাচীন ব্যবস্থা কি আর এত সময় পর্যন্ত ধরে রাখা যায়? এখন হচ্ছে লিভিং টুগেদার। যত দিন ইচ্ছে একসঙ্গে থাকা, যখন আর ভালো লাগছে না, তখন দূরে সরে যাওয়া। কারো কোনো দায়িত্ব নেই। দায়িত্ব থাকলেই ভালোবাসা শিকলে আটকে যায়। শিকলে কি আর মায়াবী পাখি ধরা পড়ে?

টম যেখানে থাকে সেটি কোনো এ্যাপার্টমেন্ট নয়। চমৎকার একটি বাড়ি। সামনে লন আছে, ফুলের বাগান আছে, পেছনে চমৎকার সুইমিং পুল। বাড়ির মালিক এক মাসের জন্যে যাচ্ছে সুইজারল্যাণ্ড। সে-জন্যে সে বাড়িটা চার মাসের জন্যে ভাড়া দিতে চায়। ভাড়া নামমাত্র, মাসে চার শ ডলার। সবটা টাকা একসঙ্গে দিতে হবে।

টমের বাড়ি পছন্দ হয়ে গেল। রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি, পছন্দ না হয়ে উপায় আছে?

আমি নেব তোমার বাড়ি।

টমের পোশাক-আশাক দেখে বাড়ির মালিক ঠিক ভরসা পায় না। গম্ভীর হয়ে বলে, ষোল শ ডলার একসঙ্গে দিতে হবে কিন্তু।

বেশ তো, নিয়ে আসব বিকেলে। তুমি ঘরে থাকবে তো?

যেহেতু বিকেলে গেলে ভদ্রলোককে ঘরে পাওয়া যাবে, সেহেতু টম আর বিকেলে গেল না। পরদিন দুপুরে গিয়ে হাজির। ভদ্রলোক ঘরে নেই, তার স্ত্রী দরজা খুলল। টম হাসিমুখে বলল, আমি তোমার বাড়ি ভাড়া করতে এসেছি। তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

ও হ্যাঁ, তোমার জন্যে সে অপেক্ষা করছিল। তুমি কি ষোল শ ডলার নিয়ে এসেছে?

নিয়ে এসেছি।

টম কাঁধের ব্যাগ থেকে কাগজে মোড়া একটি পেইনটিং বের করল। গম্ভীর মুখে বলল, এর দাম কম করে হলেও তিন হাজার ডলার, তোমাকে জলের দামে দিচ্ছি।

ভদ্রমহিলা স্তম্ভিত।

ভয় নেই, পছন্দ না হলে নগদ দাম দেব। দেখ ভালো করে।

সন্ধ্যাবেলার ছবি। পুরনো ধরনের একটি লাল রঙ ইটের বাড়ির ভাঙা জানালা দিয়ে একটি কিশোরী মেয়ে উঁকি দিচ্ছে। মেয়েটির চোখে-মুখে সূর্যের রক্তিম আলো। ছবি থেকে চোখ ফেরান মুশকিল। ভদ্রমহিলা আমতা আমতা করতে লাগলেন।

আমার হাসবেণ্ডের সঙ্গে কথা না বলে তো রাখতে পারি না।

বেশ, তাহলে নগদ দাম দিচ্ছি। টম গম্ভীর মুখে পকেটে হাত রাখল। (পকেটে একটি মাত্র পঞ্চাশ ডলারের নোট)। ভদ্রমহিলা থেমে থেমে বলল, তার চেয়ে এক কাজ কর, ছবিটা রেখে যাও। আমি ওর সঙ্গে আলোচনা করে তোমাকে জানাব!

বেশ তো, বেশ তো।

টম জানে এই মেয়েটির স্বামীকে ছবিটি রাখতেই হবে। অবশ্য একটি ভালো ছবি হাতছাড়া হল। তাতে কিছুই আসে যায় না। কাউকেই ধরে রাখা যায় না। সমস্তই হাতছাড়া হয়ে যায়।

রুনকি যখন প্রথম উঠে এল টমের ঘরে, তখন টম সিরামিক্সে কিছু ফ্যান্সি পেইন্ট করছিল। দশটি টবের অর্ডার আছে, বিকেল পাঁচটার মধ্যে দিতে হবে। সময় লাগছে খুব বেশি। রুনকিকে ঢুকতে দেখে টম ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, কিছু বলল না। রুনকি বলল, তোমার সঙ্গে থাকতে এলাম টম।

বেশ তো, ভালো করেছ।

টম ছবি আকায় মন দিল। নীল রঙটা ঠিক মানাচ্ছে না, কেমন যেন লেপ্টে লেপ্টে যাচ্ছে। রুনকি গম্ভীর হয়ে বলল, আমি বাবা-মা সবাইকে ছেড়ে এসেছি। তুমি বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারছ না।

টম ডিজাইন থেকে চোখ তুলেই বলল, বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে থাকতে আসাটা ঠিক হত না। আমি বুড়ো-বুড়ি সহ্য করতে পারি না।

তুমি মন দিয়ে শুনছ না টম। দয়া করে শোন আমি কী বলছি। তাকাও আমার দিকে। প্লীজ।

টম তাকাল।

আমি তোমার জন্যে সব ছেড়েছুড়ে এসেছি।

রুন, এটি তুমি ভুল বললে। তুমি আমার জন্যে আস নি। এসেছ নিজের জন্যে। আমি তোমাকে কখনো আসতে বলি নি। মনের মধ্যে এসব ভুল ধারণা থাকা ঠিক না। এতে পরে কষ্ট পাবে।

রুনকি জবাব দিল না। টম বলল, চট করে কফি বানিয়ে আন তো দেখি আমার জন্যে। চিনি দু চামচ চাই, নো ক্রীম। বাইরে থেকে টমকে ভবঘুরে ও ছন্নছাড়া মনে হলেও আসলে সে মোটেও সে-রকম নয়। রুনকি অবাক হয়ে দেখল, টমের অত্যন্ত গোছোল স্বভাব। সিগারেট খেয়ে ঘরময় ছড়িয়ে রাখে না। হৈ-চৈ হুঁল্লোড় কিছুই করে না। রুনকির ঘুম ভাঙার আগেই সে ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফার্স্ট তৈরি করে ছবি নিয়ে বসে। ঘণ্টা তিনেক একনাগাড়ে কাজ করে। এই সময় তার মূর্তি ধ্যানী পুরুষের মূর্তি। কথা বললে জবাব দেবে না। চা খাবে না, সিগারেট খাবে। সকালের কাজ শেষ হলেই ঘণ্টাখানেক শুয়ে থাকবে চুপচাপ। তার ভাষায় এটি হচ্ছে মেডিটেশন। বারোটা নাগাদ লাঞ্চ তৈরী হবে। লাঞ্চ শেষ করেই বেরুবে কাজের খোঁজে। সব দিন কাজ পাওয়া যায় না। ঘোরাঘুরিই

সার। তখন সে তার আঁকা চমৎকার একটি ছবি রাস্তার মোড়ে টাঙিয়ে বসে থাকবে। ছবির নিচে বড়ো বড়ো হরফে লেখা–এক জন দুরারোগ্য ক্যানসারে মরণাপন্ন শিল্পীকে সাহায্যের জন্যে ছবিটি কিনুন। এই শিল্পী গোগ্যাঁর মতো ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছেন, কিন্তু হয়, ভাগ্যের কী ছলনা! ছবি বিক্রি হয়ে যায় চট করে। যে-কোনো ছবি বিক্রি হলেই টমের খানিক মন খারাপ হয়। বিড়বিড় করে নিজের মনে–কিছুই ধরে রাখা যাচ্ছে না। কোনো-কোনো দিন মনখারাপের তীব্রতা এতই বাড়ে যে, সে হুইস্কি খেতে খেতে চোখ লাল করে বাড়ি ফেরে। রুনকিকে গম্ভীর হয়ে বলে প্রচুর ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলাম, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। লাল হচ্ছে আমার সবচে ফেবারিট কালার, অথচ লাল রঙের ব্যবহারটা এখনো শিখতে পারলাম না। এরকম জীবনের কোনো মানে হয়?

এই জাতীয় কথাবার্তার কোনো অর্থ হয় না, বলাই বাহুল্য। তবু রুনকির ভয় করে। বড়ো শিল্পী না হওয়াই ভালো। টম আর দশ জন মানুষের মতো সহজ স্বাভাবিক মানুষ হোক। সংসারে ভালোবাসা থাকুক, সুখ থাকুক। খ্যাতির কি সত্যি কোনো প্রয়োজন আছে?

টম অবশ্যি রুনকিকে খুবই পছন্দ করে। তবু রুনকির ভয় কাটে না। সব সময় মনে হয়, এক দিন সে হয়তো ভালোমানুষের মতো ঘর থেকে বেরুবে, আর ফিরবে না। পৃথিবীতে এক ধরনের মানুষ আছে যাদের ভালোবাসা দিয়ে ধরে রাখা যায় না।

রুনকি নিজেকে মানিয়ে নিল খুব সহজেই। বাজার করা, রান্না করা।–কোনো কিছুই আর আগের মতো জটিল মনে হল না তার কাছে। বাইরে বেরুলে একটি ক্ষীণ অস্বস্তি অবশ্যি থাকে মনের মধ্যে।–যদি পরিচিত কারোর সঙ্গে দেখা হয়? সবচে ভালো হত যদি টমকে নিয়ে বহু দূরে কোথাও চলে যাওয়া যেত। প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট্ট কোনো একটা দ্বীপে।

যেখানে জনমানুষ নেই। সারাক্ষণ হুঁ-হুঁ করে হাওয়া বইছে। সন্ধ্যাবেলা আকাশ লাল করে সূর্য ডুবে হঠাৎ করে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়।

টমের এই বাড়িটিও অবশ্যি দ্বীপের মতোই। শহরের বাইরে খোলামেলা একটা বাড়ি। কেউ ঠিকানা জানে না বলেই কেউ আসে না। রুনকি মাকে টেলিফোন করে ঠিকানা দিতে চেয়েছিল। রাহেলা শান্ত স্বরে বলেছেন, তোমার ঠিকানার আমার কোনো প্রয়োজন নেই রুনকি। তোমার ঠিকানা তোমার কাছেই থাকুক।

ঠিকানা না রাখলে টেলিফোন নাম্বার রাখ।

রাহেলা উত্তর না দিয়ে টেলিফোন নামিয়ে রেখেছেন। কেউ জানে না রুনকি কোথায় আছে, তবু এক দিন শফিক তার ভাঙা ডজ গাড়ি নিয়ে এসে উপস্থিত। রুনকির বিস্ময়ের সীমা রইল না। শফিক গাড়ি থেকে নেমেই বলল, বাংলাদেশী কায়দায় তোমাদের একটা বিয়ের ব্যবস্থা করবার জন্যে এলাম। গায়ে হলুদ-টলুদ সব হবে। বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়িতে রুই মাছ যাবে।–গায়ে হলুদের তত্ত্ব। দেশের একটা পারলিসিটি হয়ে যাবে। মেলা লোকজনকে বলা হবে, কি বল?

রুনকি বহু কষ্টে হাসি সামলায়।

টম বুঝি রাজি হবে! তোমার যে কি সব চিন্তাভাবনা শফিক ভাই!

রাজি হবে না মানে? টমের ঘাড় রাজি হবে। ব্যাটা দেশের একটা বেইজ্জতী করে ফেলেছে। বাংলাদেশী মেয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে এসে...

রুনকি গম্ভীর মুখে বলল, শফিক ভাই, টম কাউকে ভাগিয়েটাগিয়ে আনে নি। আমি নিজেই এসেছি। আর আমার জন্যে তোমার বাংলাদেশের কোনো বেইজ্জতী হয় নি। আমি বাংলাদেশী নই। আমি বাই বার্থ আমেরিকান। আমার বাবা-মার মতো নেচারালাইজড সিটিজন না।

শফিক সারা দিন থাকল রুনকির ওখানে! দি মেঘনা রেস্টুরেন্ট খোলার ব্যাপারে তার রুনকির সাহায্য দরকার। হুলস্থূল কাণ্ড করতে হবে সেখানে। লাঞ্চ ও ডিনারের টাইমে পল্লীগীতির সুর বাজবে। বাংলাদেশের বিখ্যাত সব শিল্পীদের তেলরঙের নিসর্গ-দৃশ্যের ছবি দিয়ে সাজান হবে লবি। খাওয়ার শেষে হাতে তুলে দেওয়া হবে এক খিলি পান এবং খাঁটি বাংলায় বলা হবে–আবার আসবেন।

কিন্তু–টাকাটা তুমি পাচ্ছ কোথায়?

সবার কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে যোগাড় হবে। তোমাকেও দিতে হবে। ছাড়াছড়ি নাই।

আমার কাছে আছেই কুল্যে এক শ ডলার।

দাও, এক শ ডলারই সই। তোমাকে দিয়েই শুরু।

সারা দিন অপেক্ষা করেও টমের দেখা পাওয়া গেল না। সে আসবে রাত আটটায়। রুজভেল্ট স্কুলের কী-একটা ডেকোরেশনের কাজ নাকি পেয়েছে। শেষ করে ফিরবে।

১০. অক্টোবর মাস

অক্টোবর মাস। বরফ পড়ার সময় নয়, কিন্তু আবহাওয়া অফিস বলেছে তুষারপাত হতে পারে। সম্ভাবনা শতকরা বিশ ভাগ। আকাশ অবশ্যি পরিষ্কার। ঝকঝকে রোদ। সন্ধ্যার আগে আগে দেখা গেল সব ঘোলাটে হয়ে আসছে। সাড়ে ছটা থেকে ঝুরঝুর করে বরফ পড়তে শুরু করল। বৎসরের প্রথম বরফ, খুশির ঢেউ খেলে গেল চারদিকে। ছেলে-বুড়ো সবাই চোখ বড়ো বড়ো করে বলছে–আহ! কী চমৎকার তুষার পড়ছে। হাউ লাভলি!

রাত নটার খবরে বলল–কানাডা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে আর উষ্ণ হওয়া আসছে সাউথ থেকে, কাজেই সারা রাত ধরে ব্লিজার্ড হতে পারে। ইতোমধ্যে এক ফুটের মতো বরফ পড়েছে। রাস্তা ঘাট পিছল। কেউ যেন বিনা প্রয়োজনে বাইরে না। যায়। হাইওয়ে আই নাইন্টি বন্ধ। বড়োই ফুর্তির সময় এখন। শুরু হবে ব্লিজার্ড পার্টি। উপকরণ সামান্য–বিদ্যার, বাদাম ভাজা এবং চড়া মিউজিক। বৎসরের প্রথম ব্লিজার্ডকে স্বাগত জানানরা এই হচ্ছে ফার্গোর সনাতন পদ্ধতি।

আনিস মোটা একটি কম্বল গায়ে জড়িয়ে সোফায় আরাম করে বসল। ঘরে একটি ফায়ারপ্লেস আছে। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালানির কায়দা-কানুন তার ভালো জানা নেই। চিমনি পরিষ্কার আছে কিনা কে জানে। এর চেয়ে কম্বল জড়িয়ে থাকাই ভালো। কফি-পটে কফি, গরম হচ্ছে। টিভিতে দেখাচ্ছে ডেভিড কপারফিল্ডের ম্যাজিক। হাতের কাছে দুটি রগরগে ভূতের বই। একটি ষ্টিফান কিংয়ের সাইনিং। নিউইয়র্ক টাইমস-এর মতে কোনো সুস্থ লোক এই বই একাএকা পড়তে পারবে না। অন্যটি ডিমস কিলেনের দি আদার নুন।

পিশাচ নিয়ে লেখা রক্ত-জল—করা উপন্যাস। রিজার্ভের রাতের জন্যে এর চেয়ে ভালো প্রস্তুতি কল্পনাও করা যায় না।

আনিস জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল। বরফে সমস্ত ঢেকে গেছে। বাতাসের সঙ্গে উড়ছে বরফের কণা। গাছের পাতায় মাখনের মতো থরে থরে তুষার জমতে শুরু করেছে। একটি ধবধবে সাদা রঙের প্রকাণ্ড চাদর যেন ঢেকে ফেলেছে। শহরটিকে। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সাদা চাদর নৌকার পালের মতো কাঁপছে তিরতির করে। অপূর্ব দৃশ্য! চোখ ফেরান যায় না। আনিস মন্ত্রমুগ্ধের মতো জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। মালিশা গিলবার্ড এসে উপস্থিত হল এই সময়।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও তার গায়ে পাতলা একটা উইণ্ড ব্রেকার ছাড়া আর কিছুই নেই। কালো একটা স্কাফে কান দুটি ঢাকা। হাতে খাবারের একটি প্যাকেট। মালিশা বলল, আমি ভাবলাম কেউ নেই। অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছি, ঘরে তোমার বান্ধবীরা কেউ আছে বুঝি?

আনিস বলল, ভেতরে এস। এ রকম দিনে বেরুলে কী জন্যে?

মালিশা বলল, তুমি কথার জবাব দাও নি। ঘরে কি তোমার বান্ধবীরা কেউ আছে?

না, তা নেই।

যাক, আমি শুধু দু জনের জন্যে খাবার এনেছি।

মালিশ খানিকটা কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে প্যাকেট খুলতে শুরু করল।

আনিস বলল, স্কার্ফটা খুলে মাথা মুছে নাও। এত তাড়া কিসের মালিশা?

তাড়া আছে। দুপুরে খাই নি কিছু। খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে আছে। গরম করতে দিয়ে তারপর হাত মুখ ধোব।

খাবার বিশেষ কিছু নয়। বড়ো একটি প্যান পিজা, কয়েকটি মেক্সিকান টেকো এবং এক বোতল সস্তা বারগাণ্ডি।

আনিস বলল, কোনো বিশেষ উপলক্ষ আছে কি মালিশা?

আজ আমার জন্মদিন।

আনিস হাসিমুখে বলল, দু মাস আগে এক বার তুমি জন্মদিনের খাবার খাইয়েছি।

ঐ দিন মিথ্যা বলেছিলাম। তোমাকে কোথাও নিয়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল। জন্মদিনের অজুহাত দিয়ে নিয়ে গেলাম।

এমনি বললে বুঝি যেতাম না?

না। আমি ভালো মেয়ে নই। আমার সঙ্গে বেরুতে হয়তো তোমার সংকোচ হত।

মালিশ দ্রুত হাতে খাবার ওভেনে ঢুকিয়ে মাথার চুল মুছতে শুরু করল।

হঠাৎ করে এসেছি বলে রাগ কর নি তো? টেলিফোন করব ভেবেছিলাম। পরে ভাবলাম টেলিফোনে তুমি বলে বসতে পোর।–আমি ব্যস্ত। সামনাসামনি কেউ এমন কথা বলতে পারবে না। আনিস, তুমি কি বিরক্ত হচ্ছে?

বিরক্ত হব কেন? কিন্তু জন্মদিনের কেক কোথায়?

কেক কেনা গেল না। টাকা কম পড়ে গেল, তাছাড়া কেক আমার ভালোও লাগে না।

আনিস লক্ষ করল মালিশার চোখ ঈষৎ রক্তাভ। একটু যেন ঢুলছে।

তুমি কি প্রচুর ড্রিংক করেছ মালিশা?

প্রচুর নয়, তবে করেছি। একা-একা ভালো লাগছিল না।

টেলিফোন করলেই একটা কেকের ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু আবহাওয়ার যা ধরনধারণ, কেউ কি অর্ডার নেবে? চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আনিস বসবার ঘরে চলে এল। গলা উঁচু করে বলল, তুমি খাবার সাজাও মালিশা। আমি একটা টেলিফোন সেরে আসছি। অর্ডার ওরা নিল। বলল এক ঘণ্টার মধ্যে দিয়ে যাবে। শুধু কেক নয়, দশটি লাল গোলাপের একটি তোড়াও আসবে সেই সঙ্গে। আনিসের মনে হল, সে নিজেও খুব নিঃসঙ্গ। মালিশ হঠাৎ করে আসায় তার খুবই ভালো লাগছে। একটা কেমন যেন অন্য ধরনের আনন্দ।

আনিস, পিজা তোমার ভাল লাগে তো?

খুব লাগে।

সস্তার মধ্যে খুব ভালো খাবার, তাই না?

তা ঠিক।

মালিশ হাসিমুখে বলল, আমার বয়স একুশ। একুশ বছরের একটি মেয়ের জন্মদিনে কোনো লোকজন নেই, কেউ বিশ্বাস করবে একথা? জন আসবে বলেছিল, আমি এইসব কিনেছিলাম জন এবং আমার জন্যে। তার নাকি হঠাৎ মাইগ্রেন পেইন শুরু হয়েছে।

আনিস বলল, জন কে?

আমার এক জন বন্ধু। সিয়ার্সে কাজ করে। তোমার কি মনে হয় ওর সত্যি সত্যি মাইগ্রেন পেইন?

আনিস উত্তর দিল না। মালিশা বলল, জনের এক জন নতুন বান্ধবী হয়েছে। একটি মেক্সিকান মেয়ে। ও নির্ঘাত ওর সঙ্গে ঝোলাঝলি করছে। তোমার কী মনে হয়?

আমার পক্ষে বলা মুশকিল। নির্ভর করে জনের সঙ্গে তোমার পরিচয় কী রকম তার ওপর।

পর পর চার শনিবার ডেট করেছি। জন নিজেও ডেট চেয়েছে। দু রাত ঘুমিয়েছি ওর সঙ্গে। ওটা ঠিক হয় নি। ওতে দাম কমে যায়। তাছাড়া ঐ মেক্সিকান মেয়েটিকে তো তুমি দেখ নি। দারুণ ফিগার। পুরুষদের কাছে ফিগারটাই আসল।

আনিস প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বলল, তোমার মা কেমন আছে?

ভালোই। গত সপ্তাহে চিঠি পেয়েছি। বুড়ির শখ হয়েছে বিশ্বভ্রমণের। একজন সঙ্গীও পেয়েছে–জিম ডগলাস। মনে হয় ঐ বুড়ো ফুসলেফাসলে নিয়ে যাচ্ছে। টাকার গন্ধ পেয়েছে, বুঝলে না? দু জনে ফিট করে বিয়েও করে বসতে পারে। তাহলে বড়োই ঝামেলা হবে। হয়তো দেখা যাবে কিছুই পেলাম না। আমার যা ভাগ্য!

কোথায় যাচ্ছেন তোমার মা?

কে জানে কোথায়? আমি লিখেছি।–যাও মা, ঘুরে আসা। তোমার ভালো লাগাই আমার ভালো। এবং ডগলাস সাহেব যখন যাচ্ছেন, তখন তো তোমার খুব ফান হবে। মনের কথা নয় বুঝতেই পারছি, সবই বানান।

মালিশা খাবার কিছুই স্পর্শ করল না। চকচক করে এক গ্লাস বারগাণ্ডি খেয়ে ফেলল। তার মনে হয় নেশা হয়েছে। চোখের কোণ লালাভ।

শোন আনিস, আমার মনে হয় আমি তোমাকে ভালোবাসি। হাসছ কেন? তোমার কি ধারণা, আমার নেশা হয়েছে? মোটেই নয়।

আনিস বলল, কফি খাবে?

না। শোন আনিস। আমার মিলিওনিয়র হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে? ভালোই হবে তোমার।

আনিস হাসতে-হাসতে বলল, টাকার জন্যে তোমাকে বিয়ে করতে হবে কেন? তোমার নিজের দাম তো কিছু কম নয়।

আমাকে খুশি করার জন্যে বলছ?

না। নিশানাথ বাবুর কথা মনে নেই, তিনি বলেছিলেন তোমাকে দেখতে ইণ্ডিয়ান গডেসের মতো লাগে।

আমার মনে আছে। আনিস, আমার যখন টাকা হবে, তখন আমি ঐ ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোককে একটি বুইক স্কাইলার্ক গাড়ি কিনে দেব। ওর কি বুইক স্কাইলার্ক গাড়ি আছে?

না, ওর সে-সবের বালাই নেই।

ম্যাকের স্কাইলার্ক গাড়ি ছিল। ম্যাক ছিল দারুণ বড়লোক। ওর সঙ্গে আমি অনেক বার ডেটে গিয়েছি। ও আমাকে একটা ড্রেস কিনে দিয়েছিল, যার দাম দু শ পাঁচাত্তর ডলার। আমি তোমাকে দেখাব।

আনিস চুপ করে রইল। মালিশা মনে হল একটু টলছে। আনিস বলল, আর খেও না, মালিশা।

কেন? খাব না কেন?

বেশি হয়ে যাচ্ছে। তোমার হাত কাঁপছে।

হাত কাঁপছে, কারণ আমার জ্বর আসছে। আমার শরীর বেশি ভালো নয়।

ডাক্তার দেখিয়েছ?

না। ডাক্তার দেখাবার মতো কিছু নয়, তা ছাড়া আমার হেলথ ইনসুরেন্স নেই। ডাক্তারের কাছে গেলেই গাদাখানিক ডলার লাগবে। সেটা কে আমাকে দেবে? তুমি নিশ্চয়ই দেবে না। হা হা হা।

কেক চলে এল দশটার দিকে। সিলোফেন কাগজে মোড়া দশটি লাল টুকটুকে গোলাপ। মালিশা অনেকক্ষণ অবাক হয়ে দেখল ফুলগুলি। আনিস হাসিমুখে বলল, শুভ জন্মদিন, মালিশা।

মালিশা জবাব দিল না। তার চোখে জল আসছে। সে তা গোপন করবার জন্যে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল।

১১. প্রচণ্ড শীত পড়েছে

এ বৎসর প্রচণ্ড শীত পড়েছে।

ফার্গোতে যারা বসবাস করে তারা পর্যন্ত বলছে।–ন্যাস্টি ওয়েদার। ফেব্রুয়ারি মাসেই চার ফুটের মতো বরফ জমে গেল শহরে। সন্ধ্যার পর লোকজন আর ঘর ছেড়ে বের হয় না। কেউ যে শপিং-এ গিয়ে ঘুরেফিরে মন তাজা করবে, সে উপায় নেই। ঘণ্টাখানিক গাড়ি ঠাণ্ডায় পড়ে থাকলেই আর স্টার্ট নেবে না। বড়ো বড়ো উইন্টার সেল হচ্ছে, সেখানে পর্যন্ত লোকজন নেই।

টমের দিনকাল বেশ খারাপ হয়ে গেল। কাজ নেই। গোটা ফেব্রুয়ারি মাসে বাচ্চাদের বইয়ের একটি ইলাস্ট্রেশন ছাড়া আর কোনো কাজ জুটল না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছবি বিক্রিও বন্ধ। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পায়ে হেঁটে কেউ চলাফেরা করে না! সবাই বের হয় গাড়ি নিয়ে। কার দায় পড়েছে গাড়ি থামিয়ে ছবি কিনবে? সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে, বাড়িটি ছেড়ে শহরতলির একটা এ্যাপার্টমেন্ট নিতে হয়েছে। সেখানে রান্নাঘর এবং বাথরুম শেয়ার করতে হয়। টম বেশ কয়েক বার বলেছে, এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে, কিন্তু বলা পর্যন্তই। সে নাকি বরফে—ঢাকা শহরের কয়েকটি ছবি একেই বিদায় হবে। ছবি একে ফেললেই হয়, কিন্তু এখনো তার মনমতো বরফ জমা হয় নি।

প্রকৃতির কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত একটি শহরের ছবি আঁকব, তারপর বিদায়। বুঝলে রুনকি, এখনো সময় হয় নি।

পরাজিত হবার আর বাকি কোথায়?

অনেক বাকি। এখনো বাকি আছে।

এই এ্যাপার্টমেন্টটিতে রুনকির গা ঘিনঘিন করে। যে–মেয়েটির সঙ্গে রান্নাঘর ও বাথরুম শেয়ার করতে হয়, সে সবকিছু বড়ো ময়লা করে রাখে। গভীর গাত পর্যন্ত হাই ভল্যুমে গান শোনে। সময়ে-অসময়ে টমের কাছে সিগারেট চায়। ভালো লাগে না রুনকির। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। প্রায়ই এ্যাপার্টমেন্টের সিঁড়িতে মদ খেয়ে লোকজন গলা ফাটিয়ে চেঁচায়। কিছুদিন আগেই পুলিশ এসে ছ নম্বর ঘর থেকে একটি লোককে ধরে নিয়ে গেল। এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যেতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যায়। কিন্তু যাবার উপায় নেই, এর চেয়ে সস্তায় ফার্গোতে এ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া যাবে না। টম নিজেও অনেক খোঁজাখুজি করেছে। কিন্তু ওর হাত একেবারেই খালি। অবস্থা এরকম চললে আন-এমপ্লয়মেন্ট বেনিফিটের জন্যে হাত পাততে হবে। টমের তাতে খুবই আপত্তি।

আমি কি ভিখিরি, যে আন-এমপ্লয়মেন্ট নেব?

যখন কিছুই থাকবে না, তখন কী করবে?

তখন অন্য কোথাও যাব। এই নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

কোনো কাজ-টাজ করে টমকে সাহায্য করার ইচ্ছা হয়। রুনকির, কিন্তু শীতের সময়টায় কাজ পাওয়া খুব মুশকিল। একটি কাজ পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণ ফার্গোতে। গাড়ি ছাড়া অত দূর যাওয়ার কোনোই উপায় নেই। বাস ঐ লাইনে যায় না। টমের গাড়িও নেই। দিন-

রাত ঘরেই বসে থাকতে হয় রুনকির। ইউনিভার্সিটির ক্লাস বাদ দিতে হয়েছে। উইন্টার কোয়ার্টারে নাম রেজিস্ট্রি করা হয় নি। ধারে সাত শ ডলার যোগাড় করা গেল না।

টম কাজের খোঁজে সারা দিন ঘোরাঘুরি করে। রুনকি ঘরেই থাকে। ভালো লাগে না। টম সেদিন বলল, তুমি বাবা-মার কাছে ফিরে যাও, রুনকি।

কেন?

তোমার এখানে আর মন লাগছে না।

আমি কি বলেছি, মন লাগছে না?

বলতে লজ্জা লাগছে বলে বলছ না। বাবা-মার কাছে ফিরে যেতেও তোমার লজ্জা লাগছে। লজ্জার কিছু নেই, রুনকি।

তুমি বড্ড বাজে কথা বল, টম।

টম হেসে বলেছে, এইটি তুমি ভুল বললে রুনকি। বাজে কথা আমি কখনে, বলি না। তোমার মধ্যে দ্বিধা দেখতে পাচ্ছি বলেই বলছি।

তোমার কি ধারণা, আমি আর তোমাকে ভালোবাসি না?

সে কথা আমি বলি নি, রুন।

তুমি কি আমাকে ভালোবাস?

তুমি খুব চমৎকার একটি মেয়ে। তোমাকে যে কেউ ভালোবাসবে।

তুমি কিন্তু আমার কথার জবাব দাও নি।

আমি তোমাকে খুবই ভালোবাসি রুনকি।

যদি সত্যি ভালোবাস, তাহলে,–প্লীজ, চল, অন্য কোথাও যাই।

আর কয়েকটা দিন, প্রকৃতির কাছে শহরের পরাজয়ের ছবিটা শেষ করেই রওনা হব।

রুনকির এখন মাঝেমাঝে ইচ্ছা করে মার সঙ্গে গিয়ে কথা বলে, কিন্তু সাহস হয় না। তার দিকে তাকিয়েই মা নিশ্চয়ই বুঝে ফেলবেন ব্যাপারটা। মায়েরা অনেক কিছু বুঝতে পারে।

শফিক এসেছিল সেদিন। সে শুধু বলল, বাহ্, স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে তোমার রুনকি।

রুনকি একবার ভাবলা, শফিককে বলবে ব্যাপারটা। কিন্তু বলতে-বলতেও সামলে গেল। টমকে আগে জানান উচিত। টমের আগে অন্য কারোর জানা ঠিক নয়।

শফিক এলেই অনেক খবর পাওয়া যায়। সমস্তই বাংলাদেশের খবর।

বুঝলে রুনকি, জিয়াউর রহমান সাহেবের নাম হয়েছে এখন জিয়াউর রহমান খাল কাটি। শুধুই খাল কাটছে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

জিয়াউর রহমান কে?

মাই গড! আমাদের প্রেসিডেন্ট। ফেরেশতা আদমি।

তাই নাকি?

বেচারার একটা হাফ শার্ট আর দুটো ট্রাউজার, আর কিছুই নেই।

কী যে তুমি বল শফিক ভাই।

এই তো, বিশ্বাস হল না। মিথ্যা বলব কেন খামাখা? একটা পয়সা বেতন নেয় না গভর্মেন্টের কাছ থেকে।

বেতন না নিলে চলে কী করে?

চলে আর কোথায়? কিছুই চলে না। দেশের জন্য লোকটার জান কবুল। নিজের দিকে তাকাবার সময় আছে?

শফিক এলে রুনকি কিছুতেই যেতে দেয় না। বাংলাদেশী রান্না রাঁধতে চেষ্টা করে। ভাত রান্না হয় সেদিন।

রানা কেমন হয়েছে শফিক ভাই? মার মতো হয়েছে?

চমৎকার! ফাস ক্লাস।

ভাতটা বেশি নরম হয়ে গেছে, না?

নরমই আমার কাছে ভালো লাগে। চাবানর দরকার হয় না। মুখে ফেললেই হড়হড় করে নেমে যায়।

চাকরি পেয়েছ শফিক ভাই?

না। জোসেফাইনকে খুব তেলাচ্ছি, কাজ হচ্ছে না।

অন্য কোথাও চেষ্টা কর।

গ্রীন কার্ড নেই, কাজ দেবে কে আমাকে? গভীর সমুদ্র।

সেবার যে বলেছিলে ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টে একটা কাজ পাবে?

সম্ভাবনা চল্লিশ পার্সেন্ট। বাঁদরের দেখাশোনা। খাঁচা পরিষ্কার রাখা। ওদের ব্যালেন্সড ডায়েট দেওয়া। ড. লুইসের হাতেই সব, দেখি ব্যাটাকে ভজনা যায় কিনা। শালার দয়া-মায়া কিছুই নেই শরীরে। দুঃখের কথা বলেও লাভ হয় না।

পরাজিত শহরের ছবি টমের আঁকা হল না। মন্টনার ছোট্ট একটি শহরে কাজ পাওয়া গেল। এক ভদ্রলোক পাহাড়ের ওপর চমৎকার একটি শীতাবাস বানিয়েছেন, তার লবির ডেকোরেশন। কাজটি লোভনীয়। কারণ, যত দিন কাজ শেষ না হচ্ছে, তত দিন শীতাবাসে

থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। পাশেই স্কী করবার স্পট। জমে-যাওয়া একটি হ্রদ আছে। সেখানে উইন্টার ফিশিং-এর ব্যবস্থা আছে। বরফ খুড়ে ছিপ ফেললেই প্রকাণ্ড সব কার্প ধরা পড়ে। টম রাজি হয়ে গেল। পরাজিত শহরের ছবি পরেও আঁকা যাবে। রুনকিকে অবাক করে দিয়ে এক সন্ধ্যায় শ্যাম্পেনের একটি বোতল নিয়ে এল।

এস রুনকি, সেলিব্রেট করা যাক।

কিসের সেলিব্রেশন?

তোমার বাচ্চা আসছে, সেই সেলিব্রেশন।

রুনকি দীর্ঘ সময় কোনো কথা বলতে পারল না।

তুমি কখন জানলে?

সেটা কি খুব ইম্পটেন্ট?

শ্যাম্পেনের মুখ খোলামাত্রই কর্কটি বহু দূর ছুটে গেল। টম হেসে বলল, আমার বাচ্চা খুব ভাগ্যবান হবে। আর শোন রুনকি, আমার মনে হয় আমাদের বিয়ে করা উচিত। ম্যারেজ লাইসেন্স এখান থেকেই নিয়ে যাব। হানিমুন হবে মন্টানায়, ঠিক আছে? না কি তুমি আনমেরিড মাদার হতে চাও?

রুনকি জবাব দিল না। টম বলল, তোমাকে বিয়ের পর আমার বাবা-মার কাছে নিয়ে যাব। সিয়াটলে থাকেন তাঁরা। তাঁদের ছোট্ট একটা ফার্ম আছে, তোমার ভালো লাগবে। তবে যেতে হবে গরমের সময়। তখন ওয়েদার ভালো থাকে। ওকি রুনকি,-কাঁদছ কেন?

মন্টানায় যাবার আগে রুমনকি দেখা করতে গেল মার সঙ্গে। রাহেলা দরজা খুলে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

কী মা, ঘরে ঢুকতে দেবে না?

রাহেলা কথা বললেন না, দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন।

বাবা কোথায়?

মেনিয়াপলিস গিয়েছে।

কবে ফিরবে?

সোমবার। ও, তাহলে আর দেখা হচ্ছে না। আমরা মন্টানা চলে যাচ্ছি, মা।

রাহেলা চুপ করে রইলেন। রুনকি ওভারকোট খুলতেই শান্ত স্বরে বললেন, মা হচ্ছ তাহলে?

হ্যাঁ হচ্ছি। তোমার এমন মুখ কালো করবার দরকার নেই মা। আমরা বিয়ে করছি। ম্যারেজ লাইসেন্স যোগাড় হয়েছে। বিয়েতে আসবে না জানি, তবু কার্ড পাঠাব।

রুনকি টাওয়াল দিয়ে মাথার চুল মুছল। হালকা গলায় বলল, কফি খাওয়াবে? যা ঠাণ্ডা বাইরে।

রাহেলা কফির পটি বসালেন। রান্নাঘর থেকেই থেমে থেমে বললেন, তোমার পড়াশোনার পাট তাহলে চুকেছে।

আবার শুরু করব। তাছাড়া—

তাছাড়া কি? পুঁথিগত পড়াশোনার তেমন দাম নেই মা! পৃথিবীতে যত টেলেন্টেড লোক জন্মেছে, তাদের কারোর ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি ছিল না।

তা ছিল না, কিন্তু ওদের টেলেন্ট ছিল। তোমার তা নেই।

রুনকি হাসল। কথার উত্তর না দিয়ে কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে চলে গেল দোতলায় তার নিজের ঘরে। ঘরটি রাহেলা চমৎকার করে সাজিয়ে রেখেছেন। দেখেই মনে হবে, এই বাড়ির মেয়েটি হয়তো কলেজে গিয়েছে, ফিরে আসবে এক্ষুণি।

রুনকি দেখল, তার ব্যবহৃত কাপড়গুলি পর্যন্ত ইস্ত্রি করে রাখা হয়েছে। বার্বি ডল দুটি মা নিচ থেকে নিয়ে এসে তার ঘরে রেখেছেন। দেয়ালে রুনকির ছোটবেলার একটি ছবি–বাবল গাম দিয়ে বল বানানর চেষ্টা করছে রুনকি।

রাহেলা শুনলেন উপরে গান বাজছে। কিং ষ্টোন ট্রায়োর বিখ্যাত গান,

We had joy we had fun
We had Seasons in the Sun
But the hills we will climb
Where the Seasons out of time

তিনি নিঃশব্দে উপরে উঠে এলেন। রুনকি কার্পেটে পা ছড়িয়ে চুপচাপ বসে আছে। ক্লান্ত বিষণ্ণ একটি ভঙ্গি। কাঁদছে নাকি? রাহেলা বললেন, রুনকি, তুমি কি দুপুরে খাবে এখানে?

রুনকি চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, না মা, দুপুরে আমরা রওয়ানা হব। টম এসে এখান থেকে তুলে নেবে আমাকে।

তুমি যদি তোমার কোনো জিনিসপত্র নিতে চাও, নিতে পার।

মা, আমি কিছুই নিতে চাই না।

রুনকি চোখ মুছে বলল, তুমি কি আমার বাচ্চাটির জন্যে দুটি নাম দেবে? একটি ছেলের নাম, একটি মেয়ের নাম।

রাহেলা থেমে থেমে বললেন, আমার নাম তোমাদের পছন্দ হবে না রুনকি। তোমরা নিজেরা নাম বেছে নাও।

কেন তুমি এত রেগে আছ মা? তুমি কি বুঝতে পারছ না, আমি অনেক দূরে চলে যাচ্ছি?

দূরে গেছ অনেক আগেই। নতুন করে বোঝাবুঝির কিছু নেই।

রুনকি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, যাবার আগে পুরনো দিনের মতো তুমি কি আমাকে একটি চুমু খাবে, মা? প্লীজ।

১২. নিশানাথ বাবু

নিশানাথ বাবু খুব সকালে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন।

উদ্দেশ্য আশেপাশের গ্যারাজ-সেলগুলি খুঁজে দেখা। প্রি-উইন্টার গ্যারাজসেল শুরু হয়েছে। বুড়ো-বুড়ির দল অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গাড়ির গ্যারাজে সাজিয়ে বসে আছে। মূল্য নামমাত্র। নিশানাথ বাবু সকাল থেকেই এ সব দেখে বেড়াচ্ছেন। গ্যারাজ-সেলে ঘুরে বেড়ান। তাঁর বাতিকের মতো। যে—সব জিনিস তিনি গত চৌদ্দ বছরে কিনেছেন, তার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড পিয়ানো পর্যন্ত আছে। এম স্ট্রীটের দুতলা বাড়ি গ্যারাজ-সেলে কেনা জঞ্জাল দিয়ে তিনি ভর্তি করে ফেলেছেন। নতুন কিছু কিনে রাখবার জায়গা নেই, তবু কিনছেন।

আজ তাঁর একটি ফুলদানি পছন্দ হল। জার্মান সিলভারের ফুলদানি। খুব সুন্দর কাজ। দাম লেখা আছে। এক ডলার।

এরচে কমে দিতে পার? এক ডলার বড্ড বেশি মনে হচ্ছে।

যে—বুড়ো জিনিসপত্র সাজিয়ে বসে আছে, সে অবাক হয়ে বলল, এক ডলার কি যথেষ্ট কম নয়। ড. নিশানাথ?

নিশানাথ বাবু দেখলেন বুড়ো হচ্ছে স্টাটিসটিকসের স্ট্যানলি। মাংকি ক্যাপে সমস্ত মুখ ঢেকে রেখেছে বলে চেনা যাচ্ছে না।

গুড মনিং স্ট্যানলি।

গুড মনিং। কফি খাবে? গ্যারাজ-সেল উপলক্ষে কফি পাওয়া যাচ্ছে। পঞ্চাশ সেন্ট চার্জ, ফ্রী রিফিল।

নিশানাথ বাবু পঞ্চাশ সেন্ট দিয়ে এক পেয়ালা কফি নিলেন। বিক্রিটিক্রি কেমন?

মন্দ নয়, সাড়ে ন ডলার বিক্রি করেছি। বস তুমি, ঐ চেয়ারটাতে বস।

নিশানাথ বাবু অবাক হয়ে স্ট্যানলির দিকে তাকালেন। এই লোকটি মাসে চার হাজার ডলারের মতো পায়। দুপুরের একটা সাদাসিধা লাঞ্চের জন্যেই খরচ করে ত্রিশ-চল্লিশ ডলার। অথচ সে বাড়ির যত সব জঞ্জাল সাজিয়ে সাড়ে ন ডলার বিক্রি করে কী খুশি!

স্ট্যানলি ভারি স্বরে বলল, ওলড হোমে যাবার প্রস্তুতি, বুঝলে। জিনিসপত্র সব বিক্রিটিক্রি করে হাত খালি করছি।

প্রস্তুতি কি একটু সকাল-সকাল নিয়ে ফেলছি না?

উঁহু, রিটায়ার করবার টাইম হয়ে আসছে। বছর দুই আছে মাত্র।

নিশানাথ বাবু জার্মান সিলভারের ফুলদানি ছাড়াও একটা বড়ো আয়না কিনে ফেললেন। আয়নাটির দাম পড়ল তিন ডলার। স্ট্যানলি বারবার বলল, আয়নাটায় খুব জিতে গেলে। আমার স্ত্রী ইটালি থেকে ছ শ লীরা দিয়ে কিনেছিল।

তিনি বাড়ি ফিরলেন এগারটার দিকে। কী আশ্চর্য, রুনকি বসে আছে বারান্দার ইজিচেয়ারে! রুনকি হাসিমুখে বলল, গ্যারাজ-সেলে গিয়েছিলেন চাচা?

হুঁ।

ইশ, কী যে এক রোগ বাধিয়েছেন!

ভেতরে আয়, রুনকি।

আজ কী কিনলেন?

জার্মান সিলভারের একটা ফুলদানি, আর একটা আয়না। তুই নিবি?

না।

আয়নাটা নিয়ে যা! ভালো জিনিস, ছ শ লীরা দাম পড়েছে ইটালিতে।

পড়ুক। চাচা, আপনার কাছে বিদায় নিতে এলাম।

নিশানাথ বাবু কিছু বললেন না। চায়ের পানি চড়ালেন। রুনকি সোফায় বসতেবসতে বলল, আমরা মন্টানায় চলে যাচ্ছি।

মন্টানা খুব সুন্দর জায়গা।

আপনার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না।

নিশানাথ বাবু দীর্ঘ সময় চুপ থেকে বললেন, অল্পবয়েসী মেয়ে নিরাশ ভঙ্গিতে কথা বললে ভালো লাগে না। তাদের বলা উচিত, আবার হয়তো দেখা হবে। অর্থ একই–আনসার্টিনিটি। কিন্তু বলার ভঙ্গিটা অপটিমিস্টিক। চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবি?

না চাচা। আপনাকে একটা খবর দিই, আমরা বিয়ে করছি।

জানি। শফিক বলেছে। বাঙালী কায়দায় নাকি বিয়ে হবে?

না, সে-রকম কিছু না।

নিশানাথবাবু চা বানিয়ে এনে দেখেন রুনকি কাঁদছে। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, কাঁদছিস কেন মা?

চাচা, আমি কি ভুল করছ?

কোনটা ভুল আর কোনটা নয়, তা বোঝা মানুষের সাধ্যের বাইরে। ও নিয়ে চিন্তা করিস না। চা খা।

রুনকি চায়ে চুমুক দিল। নিশানাথ বাবু গাঢ় স্বরে বললেন, খিদিরপুরের এক কলেজে অঙ্ক পড়াতাম, বুঝলি রুনকি। কী নিদারুণ অভাব গেছে আমার! আর এখন পাসবই দেখলে

তুই চমকে উঠবি। আমি যদি খিদিরপুরে পড়ে থাকতাম, সেটা ভুল হত। আবার আমেরিকা আসাটাও ভুল হয়েছে। তাহলে ঠিক কোনটা?

রুনকি চুপ করে রইল। নিশানাথ বাবু বললেন, বেঁচে থাকার আনন্দটাই একমাত্র সত্যি। ঐটি থাকলেই হল। আয়নাটা একটা কাগজ দিয়ে বেঁধে দিই মা?

দিন।

নিশানাথ বাবু আয়নাটি গিফট র‍্যাপ করবার জন্যে পাশের ঘরে চলে গেলেন। রুনকি একটু হাসল। সে জানে, নিশানাথ বাবু শুধু আয়না কাগজ দিয়ে বাঁধবেন না। সেইসঙ্গে একটা খামের মধ্যে মোটা অঙ্কের একটা চেক থাকবে। এটি নিশানাথ বাবুর একটি পুরনো অভ্যাস। রুনকির সব জন্মদিনে তিনি রুনকিকে গল্পের বই দেন। সেই বইয়ের ভেতর একটা খাম থাকবেই; যা দেওয়ার তা সরাসরি দিয়ে দিলেই হয়, কিন্তু তা তিনি দেবেন না। কত রকম অদ্ভুত মানুষ দুনিয়াতে আছে!

১৩. মন ভেজানর সব চেষ্টা

জোসেফাইনের মন ভেজানর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বুড়ি পরিষ্কার বলে দিয়েছে, কাজ তোমাকে দেব না। মাথা-বেঠিক লোক আমি রাখি না। লুনাটিকদের বিষয়ে আমার এলার্জি আছে।

আমাকে তো তাহলে না খেয়ে থাকতে হয় জোসেফাইনা! তুমি ছাড়া কে আমাকে কাজ দেবে? উপোস দিতে হবে। আমাকে।

একেবারে কিছুই না জুটলে এখানে এসে হামবার্গার খেয়ে যাবে, চার্জ লাগবে না। কিন্তু চাকরি তোমাকে দিচ্ছি না।

ফার্গোতে বিদেশীদের কাজ পাওয়া ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। এ্যাড দেখে টেলিফোন করলেই জিজ্ঞেস করে।–গ্রীন কার্ড আছে? নেই শুনলেই খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখে। যারা কিছুটা ভদ্র, তারা মিষ্টি সুরে বলে, এখানে ওপেনিং নেই। তুমি ঠিকানা রেখে যাও, আমরা ওপেনিং হলে খবর দেব।

ওপেনিং নেই তো, এ্যাড দিলে কেন?

কয়েকটি ওপেনিং ছিল, সেগুলি ফিল্ড আপ!

দি মেঘনা রেস্টুরেন্টের জন্যে যে-টাকা পয়সা উঠেছে (সর্ব মোট সাত শ এগার ডলার), সেখানে হাত পড়েছে। রেস্টুরেন্টের চিন্তা এখন আর তেমন নেই। কারণ রহমান তার

ইণ্ডিয়া হাইস নিয়ে পিছিয়ে পড়েছে। তার ধারণা, এত ছোট শহরে বিদেশী রেস্তোর চলবে না। সে খোঁজ নিয়ে দেখেছে। এখানে যে কটি চীনা রেস্তোরা আছে, সেখানে শুক্র-শনি এই দু দিনই যা লোকজন হয়, অন্য দিন রেস্তোরা খা-খাঁ করে। তাছাড়া এই প্রচণ্ড শীতে কার এমন মাথাব্যথা যে, কাঁপতে কাঁপতে বাইরে খেতে আসবে?

এদিকে ইমিগ্রেশনের লোকজনও বেশ ঝামেলা করছে। তিন-চারটে চিঠি এসেছে, কোন দিন হুঁট করে হয়তো পুলিশ এসে হাজির হবে। ঠিকানা বদলাতে হল সেই কারণেই। নিক্স প্লেসের উল্টোদিকে ছোট একটা ঘর। শুধু শোয়ার ব্যবস্থা। খাওয়াদাওয়া নিক্স প্লেসে। বুড়ি তার কথা রেখেছে। খাওয়ার পর বিল দিতে গেলে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করে, কাজ পেয়েছ?

না।

নো চার্জ

বেশ, খাতায় লিখে রাখ, চাকরি পেলে সব একসঙ্গে দেব।

বাকির কারবার আমি করি না, ভাগো।

কাজ শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল।

ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টের সেই চাকরি। গোটা দশেক বাঁদর, কয়েকটি কুকুর আর প্রায় শ দুয়েক গিনিপিগের দেখাশোনা। সময়মতো খাবারদাবার দেওয়া। খাঁচা পরিষ্কার করা।

পশুগুলিকে পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত রাখা। কাজ অনেক, সেই তুলনায় বেতন অল্প। নব্বই ডলার প্রতি হপ্তায়। নব্বই ডলারই সই। মহা উৎসাহে কাজে লেগে গেল শফিক।

কাজটা যত খারাপ মনে হয়েছিল তত নয়। বাঁদরের খাঁচায় একটিকে পাওয়া গেল একেবারে শিশু। শফিককে দেখেই সে দাঁত বের করে ভেংচে দিল। শফিক অবাক!

আরে, তুই এইসব ফাজলামি কোত্থেকে শিখলি?

বানরের বাচ্চাটি কথা শুনে উৎসাহিত হয়েই বোধহয় থু করে এক দল থুথু ছিটিয়ে দিল শফিকের দিকে।

মহা মুসিবত হল তো শালাকে নিয়ে। মারব থাপ্পড়।

বাচ্চাটা গালি শুনে উৎসাহিত হয়ে খুব লাফালাফি শুরু করল। তার আনন্দের সীমা নেই।

সন্ধ্যা সাতটা বাজে।

আনিস সবেমাত্র ফিরেছে ইউনিভার্সিটি থেকে। হাতমুখও ধোওয়া হয় নি, শফিক এসে হাজির। এক্ষুণি যেতে হবে তার সঙ্গে।

কী ব্যাপার আগে বল।

আগে বললে আপনি আর যাবেন না।

যাব। ঘরে তেমন কিছু নেই। এখন বল ব্যাপারটা কী?

জং বাহাদুরের শয়তানিটা দেখাব আপনাকে। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না, শালা ওয়ান নাম্বার হারামী।

জং বাহাদুরটা কে?

ও, আপনাকে তো বলা হয় নি। বাচ্চা একটা বাঁদর। বাচ্চা হলে কী হবে, শয়তানের হাড্ডি। দেখবেন নিজের চোখে।

নিজের চোখে কিছু দেখা গেল না। জং বাহাদুর ঘুমিয়ে পড়েছে। শফিক খুব মনমরা হয়ে পড়ল। আনিস হাসিমুখে বলল, কালকে এসে দেখব।

সকাল-সকাল আসবেন। খাবার দেওয়ার সময় হলে কী করে দেখবেন। বিকালবেলা একটা কলা, একটা আপেল আর একটা ডিম সেদ্ধ দেওয়া হয়েছে। শালা কলা ডিমটা খেয়ে আপেলটা আমাকে সাধছে। দেখেন কাণ্ড!

তুমি না বললে শয়তানের হাড্ডি? আমার কাছে তো বেশ ভালোমানুষই মনে হচ্ছে।

আরে না-না, তার বজ্জাতির কথা তো কিছুই বললাম না।

আনিস হঠাৎ গম্ভীর স্বরে বলল, তোমার কি কোনো কাজ আছে শফিক? তোমার গাড়িতে আমাকে এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে?

কোথায়?

আনিস খানিক ইতস্তত করে বলল, একটি মেয়ের সঙেগ আমার কিছু পরিচয় হয়েছে। অনেক দিন তার খোঁজ নেই। ভাবছিলাম একটু খোঁজ নেব।

শফিক বেশ অবাক হল। আনিস থেমে বলল, আমি দেশে ফিরে যাব শফিক। আমার ভালো লাগছে না। আমি ঐ মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।

সে কোথায় থাকে?

সাউথ ফার্গো।

চলুন যাই। ফুলের দোকান হয়ে যাবেন? ফুল নেবেন?

ফুল কেন?

শফিক হাসিমুখে বলল, আমেরিকান মেয়েকে বিয়ের কথা কি ফুল ছাড়া বলা যায়? একগাদা গোলাপ নিয়ে যান। ডাউনটাউনে ফুলের দোকান সারা রাত খোলা থাকে।

আনিস দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ফুল তো কিনতেই হবে।

মালিশাকে পাওয়া গেল না। বাড়িওয়ালী সরু গলায় বলল, ওর মা মারা গেছে। ও গেছে টাকা পয়সা কিছু দিয়ে গেছে কিনা দেখতে।

কবে গিয়েছে?

এক সপ্তাহ হল।

আনিস বলল, ও কি টাকা পয়সা কিছু পেয়েছে?

আমি কী করে জানব? এক শ ডলার রেন্ট বাকি রেখে গেছে সে। আমি চিন্তায় অস্থির, টাকাটা মার গেল কি না।

আমি কি এই গোলাপগুলি তার ঘরে রেখে যেতে পারি?

পারবে না কেন? রেখে যাও। তুমি কি ওর বন্ধু?

হ্যাঁ।

ভালো। আমার ধারণা ছিল, ওর কোনো বন্ধু নেই। আমার দু জন ভাড়াটে আছে, যাদের কোনো ছেলে বন্ধু নেই। এক জন হচ্ছে মালিশা, অন্য জন এমিলি জোহান।

এমিলি জোহান?

হ্যাঁ, কবি এমিলি জোহান, নাম শুনেছ? খুব বড়ো কবি। রাইটার্স গিল্ড এওয়র্ড পাওয়া।

আমি কি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি?

না, পার না। সে এখন মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে।

ফেরার পথে আনিস একটি কথাও বলল না।

১৪. আমিন সাহেব শোভেল নিয়ে বেরুলেন

সকালবেলা একটি পার্কা গায়ে দিয়ে আমিন সাহেব শোভেল নিয়ে বেরুলেন। বরফে ড্রাইভওয়ে ঢাকা পড়েছে। পরিষ্কার না করলে গাড়ি বের করা যাবে না। অসম্ভব ঠাণ্ডা পড়েছে। চোখ জ্বালা করছে। কনকনে হাওয়া। নাক-মুখ সমস্তই ঢাকা, তবু সেই হাওয়া কী করে যেন শরীরের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। অল্পক্ষণ শোভেল চালাবার পর তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বয়স হয়েছে। এখন আর আগের মতো পরিশ্রম করতে পারেন না। দিন ফুরিয়ে আসছে। ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। চলে যাবার সময় হয়ে এল। এবারের যাত্রা অনেক দূরে। গন্তব্যও জানা নেই। আমিন সাহেব ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। রুনকি থাকলে এতটা পরিশ্রম হত না। নিমেষের মধ্যে বরফ কেটে গাড়ি বের করে ফেলত। তারপর ছোটাছুটি শুরু করত বরফের উপর। তুষার বল বানিয়ে চেঁচাত—মারব তোমার গায়ে বাবা? দেখবে আমার হাতের টিপ? মেয়েটা একেবারে ছেলেমানুষ রয়ে গেল।

না, কথাটা ঠিক হল না। রুনকি এখন আর ছেলেমানুষ নয়। আমিন সাহেব বিশ্রাম নেবার জন্যে গ্যারাজের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। তখনই চোখে পড়ল, রাহেলা দোতলার বারান্দায় একটা সাদা চাদর গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাণ্ডায় এমন পাতলা একটা চাদর গায়ে দিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে? নিউমোনিয়া বাধাবে নাকি? রাহেলা উপর থেকে ডাকলেন, চা খেয়ে যাও।

চা খেয়ে আমিন সাহেবের মনে হল তাঁর শরীর ভালো লাগছে না। নিঃশ্বাস নিতে একটু যেন কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। রাহেলা বললেন, আজকের এই দিনটি একটি বিশেষ দিন। তোমার মনে আছে?

না।

আজ রুনকির জন্মদিন।

আমিন সাহেব বড়োই অবাক হলেন। এত বড়ো একটা ব্যাপার তিনি ভুলেই বসে আছেন। উফ, কী ঝামেলাই না হয়েছিল। বরফে চারদিক ঢাকা। বেশির ভাগ ফ্লাস্তিাঘাটই বন্ধ। এর মধ্যে রাহেলার ব্যথা শুরু হল! এ্যাম্বুলেন্সে খবর দিলেই হত, তা না, তিনি গাড়ি নিয়ে বের হলেন। ফিফটিস্থ স্ট্রীট থেকে উঠিয়ে নিলেন নিশানাথ বাবুকে। কী দুরবস্থা ভদ্রলোকের। ব্যাপার-ট্যাপার দেখে আনিস বলল সেই ঠাণ্ডাতেও তাঁর কপাল দিয়ে টপ-টপ করে ঘামে পড়ছে। রাহেলা এক বার বললেন, আমার মনে হচ্ছে গাড়িতেই কিছু একটা হয়ে যাবে। নিশানাথ বাবু বললেন, মা কালীর নাম নেন, চেঁচামেচি করবেন না। রাহেলা ধমকে উঠলেন, মা কালীর নাম নেব কেন, মা কালী আমার কে? এই সময় গাড়ি স্কিড করে খাদে পড়ে গেল। উহ, কী ভয়াবহ সময়ই না গিয়েছে!

আমিন সাহেব বললেন, আমাকে আরেক কাপ চা দাও।

তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? তুমি ঘামছ।

না, শরীর ঠিক আছে।

রাহেলা বললেন, আমি রুনকির জন্মদিন উপলক্ষে ছোট্ট একটা কেকের অর্ডার দিতে চাই।

আমিন সাহেব অবাক হয়ে তাকালেন। রাহেলা চোখ নিচু করে বললেন, আমি, তুমি আর নিশানাথ বাবু!

বেশ তো।

রাহেলা মৃদু স্বরে বললেন, রুনকির প্রতি আমি অবিচার করেছি।

আমিন সাহেব জবাব দিলেন না। রাহেলা বললেন, নিজেদের মতো ওকে আমরা বড়ো করেছি। ক্যাম্পিং-এ যেতে দিই নি। ডেট করতে দিইনি।

বাদ দাও ওসব।

আমেরিকায় থাকব, অথচ বাংলাদেশী সাজাব–সেটা হয় নাকি বল?

আমিন সাহেব জবাব দিলেন না। রাহেলা বললেন, কাল রাত্রে আমি রুনকিকে স্বপ্নে দেখেছি। যেন ছোটখালার বাসায় ওকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছি। ছোটখালা বলছেন-রাহেলা তোর মেয়ে তো পরিষ্কার বাংলা বলছে। আর তুই বললি-ও বাংলা জানে না। ছোটখালাকে মনে আছে তোমার?

না।

আমাদের বিয়েতে তোমাকে মুক্তা বসান আংটি দিয়েছিলেন। সেই আংটি তোমার হাতে বড়ো হয়েছে শুনে ছোটখালা দুঃখে কেঁদে ফেলেছিলেন।

মনে পড়েছে। খুব মোটাসোটা মহিলা, তাই না?

হ্যাঁ। কী যে ভালোবাসতেন আমাকে! এখন তাঁর শুনেছি খুব দুঃসময়। ছেলেদের সংসারে থাকেন। ছেলেরা দু চক্ষে দেখতে পারে না। অসুখবিসুখে চিকিৎসা করায় না। আমি ছোটখালার নামে কিছু টাকা পাঠাতে চাই।

বেশ তো!

ভালো এ্যামাউন্টের টাকা। ছোটখালা নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন।

তা হবেন।

আমি পাঁচ শ ডলার পাঠাতে চাই।

আমিন সাহেব বললেন, আমি একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট করে আনব।

রাহেলার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল।

কাঁদছ কেন?

কই, কাঁদছি না তো। রাহেলা মৃদু স্বরে বলল, তোমাকে একটা কথা বলি নি। গত মাসে রুনকি এসেছিল।

আমিন সাহেব তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। রাহেলা বলল, রুনকির বাচ্চা হবে।

ও বলেছে তোমাকে?

হ্যাঁ।

টম কি আছে এখনো তার সঙ্গে?

আছে।

রুনকি কী জন্যে এসেছিল?

ওর বাচ্চার জন্যে দুটি নাম চায়। একটি ছেলের নাম, অন্যটি মেয়ের।

আমিন সাহেব দীর্ঘ সময় চুপ থেকে বললেন, মেয়ে হলে ওর নাম রাখব বিপাশা।

বিপাশা?

হ্যাঁ, পাঞ্জাবের একটা নদীর নাম। পাঞ্জাবে ওরা বলে বিয়াস।

তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে, তুমি খুব ঘামছ।

আমিন সাহেব ক্লান্ত স্বরে বললেন, আমার শরীরটা খারাপ লাগছে।

গাড়ি বের করার দরকার নেই। তুমি শুয়ে থাক। আর নিশানাথ বাবুকে টেলিফোন করে দাও, সন্ধ্যাবেলা যেন আসেন আমাদের এখানে, খাবেন।

আমিন সাহেব নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। তাঁর শরীর বেশ খারাপ লাগছে। এই বয়সে বরফ না কাটাই ভালো। বড়ো বেশি চাপ পড়ে। শরীর দুর্বল হয়েছে, এখন আর আগের মতো চাপ সহ্য করতে পারেন না। পরীক্ষা করলে হয়তো দেখা যাবে সুগার আছে।

নিশানাথ বাবুকে টেলিফোন করবার আগে কী মনে করে যেন দরজা বন্ধ করে দিলেন। নিশানাথ বাবুঘরেই ছিলেন।

নিশানাথ বাবু, আমি আমিন।

বুঝতে পারছি। আপনার কি শরীর খারাপ? এভাবে কথা বলছেন কেন?

আমার শরীর ভালো না। আপনাকে একটি জরুরী ব্যাপারে টেলিফোন করছি।

বলুন।

আপনি তো জানেন, আমার এই বাড়ি এবং টাকা-পয়সা সব আমি আমার মেয়ের নামে উইল করে রেখেছি। আপনি এক জন উইটনেস।

আমি জানি।

নিশানাথ বাবু, নানান কারণে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার মনের মিল হয় নি!

এই বয়সে সেটা তোলার কোনো যুক্তি নেই, আমিন সাহেব।

আমিন সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে থেমে থেমে বললেন, আমি আমার স্ত্রীর উপর একটা বড়ো অন্যায় করেছি নিশানাথ বাবু। আজ আমি যদি মারা যাই, সে পথের ভিখিরি হবে।

আমিন সাহেব, আপনার শরীর কি বেশি খারাপ?

হ্যাঁ। আপনি কি একটু আসবেন, আমি নতুন করে উইল করতে চাই।

আমি এক্ষুণি আসছি। সব কাগজপত্র নিয়ে আসব।

নিশানাথ বাবু।

বলুন।

আজ রুনকির জন্মদিন।

আমি জানি। সকালেই মনে হয়েছে।

আমিন সাহেব শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, আরেকটি কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে, আনিস ছেলেটিকে কেমন মনে হয় আপনার?

খুব ভালো ছেলে। অত্যন্ত রিলায়েবল।

আমিন সাহেব টেলিফোন করলেন আনিসকে। আনিস বেশ অবাক হল। আমিন সাহেব তাকে কখনো টেলিফোন করেন নি আগে।

আনিস, তুমি আমাকে চিনতে পারছ? আমি আমিন।

চিনতে পারছি। কী ব্যাপার বলুন তো?

আমার মেয়েটির দিকে তুমি লক্ষ রাখবে।

আনিস অবাক হয়ে বলল, আপনার কি শরীর খারাপ?

হ্যাঁ।

কী হয়েছে?

আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু মনে হচ্ছে সময় শেষ হয়ে আসছে। তুমি আমার মেয়েটির খোঁজ-খবর রাখবে। প্লীজ।

আমি আসছি। এক্ষুণি।

আমিন সাহেব দরজা খুলতেই দেখলেন রাহেলা দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। রাহেলার চোখে-মুখে স্পষ্ট ভয়ের ছাপ। রাহেলা বললেন, তোমার কী হয়েছে?

আমিন সাহেব বললেন, রাহেলা, আমি মারা যাচ্ছি।

রাহেলা আমিন সাহেবের হাত ধরে ইজিচেয়ারে শুইয়ে দিলেন।

তোমার উপর খুব অবিচার করেছি রাহেলা।

রাহেলা দ্রুত আমিন সাহেবের শার্টের বোতাম খুলে ফেললেন। তার হোত কাঁপছে। কী করবেন বুঝতে পারছেন না। আমিন সাহেব প্রচণ্ড ঘামছেন!

রাহেলা, তুমি রাগ করো না! একটা বড়ো অন্যায় করা হয়েছে।

রাহেলা দীর্ঘ দিন আগে মারা যাওয়া তার মা-কে ডাক ছেড়ে ডাকতে লাগলেন–আম্মা ও আম্মা।

১৫. মালিশা গিলবার্ট

মালিশা গিলবার্ট তার মায়ের টাকা পেয়েছে। টাকার পরিমাণ মালিশার ধারণাকেও ছাড়িয়ে গেছে। সলিসিটর যখন টেলিফোন করে বলল, তোমার জন্যে দুটি খবর আছে, একটি ভালো একটি মন্দ। কোনটি আগে শুনতে চাও?

তখনো মালিশা কিছু বুঝতে পারে নি। সে বলেছে, ভালোটি আগে শুনতে চাই।

তোমার হার্টের অবস্থা ভালো তো? খবর শুনে ফেইন্ট হতে পার।

খবর শুনে তার অবশ্যি তেমন কোনো ভাবান্তর হয় নি। বাড়িওয়ালীকে গিয়ে বলেছে, আমার মা মারা গেছেন, আমি ফ্লোরিডা যাচ্ছি। তোমার রেন্ট আমি ফিরে এসে দেব।

প্লেনে যাওয়ার মতো টাকা নেই, গ্রে হাউণ্ডের টিকিট কাটতে হল। পৌঁছতে লাগবে তেত্রিশ ঘণ্টা। গ্রে হাউণ্ডের বাস ছাড়বে রাত চারটায়। এমন লম্বা সময় কাটানও এক সমস্যা। মালিশার বারবার মনে হচ্ছিল এ্যাটর্নি ভদ্রলোক হয়তো ভুল করেছে। মা হয়তো নাম কামাবার জন্যে টাকা-পয়সা সব দিয়ে গেছে ক্যানসার ইন্সটিটিউটে কিংবা কোনো এতিমখানায়। সেইসব কাগজপত্র হয়তো এ্যাটর্নি ব্যাটা এখনো দেখে নি। না দেখেই টেলিফোন করেছে।

ফার্গো ফোরামেইতে এক বার এ-রকম একটি খবর উঠল। কোটিপতি বাবা মারা গেছে। খবর পেয়ে ছেলেরা মহানন্দে বাড়িঘর দখল করে বসেছে। কারখানায় গিয়ে কর্মচারীদের ছাঁটাই করা শুরু করেছে–এমন সময় এ্যাটর্নি-অফিস থেকে চিঠি এসে হাজির–এতদ্বারা

জানান যাইতেছে যে জনাব সোরেনসেন জুনিয়ার তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি ইথিওপিয়ার ক্ষুধার্ত শিশুদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য দান করিয়াছেন। অতএব...

মালিশার মার ব্যাপারেও সে-রকম কিছু হয়েছে কিনা কে জানে? যদি সেরকম হয়, তাহলে ফার্গো ফিরে আসার ভাড়াটাও থাকবে না। অবশ্যি ফিরে আসা এমন কিছু জরুরী নয়। তার জন্যে সব শহরই সমান।

বাসে বসতে গিয়ে মালিশা দেখল তার সীট নাম্বার তের। এটি একটি অলক্ষণ। আগে জানলে টিকিট বদলে নিত। নিশ্চয়ই মা তার জন্যে কিছুই রেখে যায় নি। আর কেনই-বা রাখবে, এক বারও কি মালিশ তার মায়ের কথা ভেবেছে? মৃত্যুর খবর পেয়ে তার তো সামান্য মন খারাপও হয় নি। ঈশ্বর এ জন্যে তাকে ঠিক শাস্তিই দেবেন। ফ্লোরিডা পৌঁছানমাত্র এ্যাটর্নি বলবে, মিস, আমাদের একটি বড়ো ভুল হয়ে গেছে। আপনার মা তার যাবতীয় সম্পত্তি আমেরিকান বন্য পশু সংস্থাকে দিয়ে গেছেন।

সে রকম কিছু হল না।

ডিরোথি গিলবাটের হাতে লেখা উইল পাওয়া গেল। এ্যাটর্নি ভদ্রলোক মিষ্টি হেসে বলল, মিস মালিশা, তুমি নিশ্চয়ই এখনো আন্দাজ করতে পারছ না যে তুমি কত টাকার মালিক?

মালিশা বলল, না, আমি পারছি না।

সব হিসাব আমাদের হাতে আসে নি। তবে যা এসেছে, তাতেই আমাদের মাথা ঘুরছে।

এ্যাটর্নিটির বয়স খুব অল্প। সে মালিশাকে দুপুরে লাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে গেল। হাসতে-হাসতেই বলল, তুমি আবার মনে করে বসবে না যে তোমার সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করছি। আমি বিবাহিত, এবং স্ত্রীকে দারুণ ভালবাসি। একা-একা যাতে তোমাকে লাঞ্চ খেতে না হয়, সে জন্যেই আমি সঙ্গে এলাম।

তোমাকে ধন্যবাদ।

কী করবে তুমি এত টাকা দিয়ে?

এখনো ভেবে ঠিক করি নি। তবে এক জনকে আমি একটি বুইক স্কাইলার্ক গাড়ি উপহার দিতে চাই।

কী রঙ?

নীল, আসমানী নীল।

কাকে দিতে চাও, জানতে পারি?

এক জন ইণ্ডিয়ানকে। তাঁর নামটি অদ্ভুত, অন্ধকারের দেবতা। সে আমার চোখের খুব প্রশংসা করেছিল।

সে ছাড়াও নিশ্চয়ই অনেকেই তোমার রূপের প্রশংসা করেছে। সবাইকেই কি তুমি বুইক স্কাইলার্ক গাড়ি দিতে চাও?

কেউ সত্যিকারভাবে আমার রূপের প্রশংসা করে নি–ঐ ভদ্রলোক করেছিল।

মিস মালিশা, এখন অনেকেই তোমার রূপের প্রশংসা করবে।

হ্যাঁ, তা করবে।

মালিশার থাকবার জায়গা করা হয়েছে হিলটনে। কাগজপত্রের ঝামেলা মিটলেই স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা করা হবে। রাতে বিদায় নেবার আগে অল্পবয়েসী এ্যাটর্নিটি হাসিমুখে বলেছে, তোমার টাকা পয়সার বিলি ব্যবস্থা করবার জন্যে এক জন দক্ষ আইনজ্ঞ দরকার।

তুমি কি এক জন দক্ষ আইনজ্ঞ?

না। তবে বিশ্বাসী।

তুমি আমার হয়ে কাজ করলে আমি খুশিই হব।

ধন্যবাদ। প্রথমেই আমি তোমার জন্যে দু জন সিকিউরিটি গার্ড রাখতে চাই। আমি কাল সকালেই ব্যবস্থা করব।

তার প্রয়োজন আছে কি?

আছে। ধনী মহিলার জন্যে অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। আমেরিকা বাস করবার জন্যে ভালো জায়গা নয় মিস মালিশ।

সারা রাত মলিশার ঘুম হল না। অনেক বার মনে হল সমস্ত ব্যাপারটাই একটা স্বপ্ন নয় তো? একটি নিখুঁত সুখের স্বপ্ন? এক্ষুণি হয়তো ঘুম ভাঙবে। বাড়িওয়ালী এসে বলবে, এ মাসের হাউস রেন্ট এক শ ডলার তুমি এখনো দাও নি। আজকে কি তুমি একটি চেক লিখতে পারবে? কিন্তু স্বপ্নটা আর ভালো লাগছে না। বড়ো খারাপ লাগছে। যেন সামনে দীর্ঘ একটা অন্ধকার পথ। হোটেল হিলটনের আরামদায়ক উষ্ণতায়ও মালিশার ভীষণ শীত করতে লাগল। সে বেল টিপে বেয়ারাকে ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমার ঘুম আসছে না। বড়ো খারাপ লাগছে।

১৬. মেমোরিয়াল লাউঞ্জ

মেমোরিয়াল লাউঞ্জে তুমুল উত্তেজনা।

অসহায় সামুদ্রিক তিমি মাছের কল্যাণে টাকা তোলা হচ্ছে। চারদিকে বড়ো বড়ো পোস্টার-তিমি মাছদের বাঁচার অধিকার আছে। নোংরা রাশিয়ান, তিমি শিকার বন্ধ কর। পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে কত তিমি মারা পড়ছে, তার পরিসংখ্যানও ঝলছে জায়গায়—জায়গায়।

মেমোরিয়াল লাউঞ্জে দুটি মেয়ে সেজেগুজে চুমু খাওয়ার স্টল (কিসিং, বুথ) খুলে বসেছে। এদের চুমু খেলে দু ডলার করে দিতে হবে। সেই ডলারটি চলে যাবে তিমি রক্ষার ফাণ্ডে। প্রচুর ডলার উঠছে। মেয়ে দুটি চুমু খেয়ে কুল পাচ্ছে না। আনিস অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুমু খাওয়া দেখল। দীর্ঘদিন আমেরিকায় থেকেও কিছু কিছু জিনিসে এখনো সে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। কিসিং বুথ তার একটি।

হ্যালো আনিস।

আনিস তাকিয়ে দেখল, ড. বায়ার। হাতে সাবমেরিন স্যাণ্ডউইচ। গালভর্তি হাসি।

তিমি ফাণ্ডে কিছু দিয়েছ?

এখনো না।

একটা এডভাইস দিচ্ছি, ঐ নীল-স্কার্ট-পরা মেয়েটিকে চুমু খেতে যেও না। সে নিশ্চয়ই দাঁত ব্রাশ করে না। ড. বায়ার ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন।

আনিস, তুমি কি লাঞ্চ খেতে যাচ্ছ?

হ্যাঁ।

আমি জয়েন করতে পারি তোমার সঙ্গে?

তা পার।

আনিস তার প্রিয় জায়গাটিতেই গিয়ে বসল। ভিড় নেই, সবাই জড়ো হয়েছে তিমি মাছদের সাহায্যের ব্যাপার দেখতে। ড. বায়ার অনবরত কথা বলে যেতে লাগলেন, আমেরিকানদের কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু ওদের না হলেও আবার কারের চলে না।

আমেরিকানরা যদি এক বৎসর কোনো ফসল না করে, তাহলে থার্ড ওয়ার্লডের চার ভাগের এক ভাগ লোক মরে ভূত হয়ে যাবে।

মুখে সবাই বলে আগলি আমেরিকান, কিন্তু হাত পাততে হয় আগলি আমেরিকানদের কাছেই, হা হা হা।

রাশিয়ানরা এ বৎসর কত লক্ষ মেটিক টন গম কিনছে জান? জান না? আন্দাজ কর তো।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

আনিস হুঁ-হাঁ করে যাচ্ছিল। ড. বায়ার তাতেই খুশি। একটির পর একটি প্রসঙ্গ টেনে আনতে লাগলেন। এক সময় আনিস বলল, আমাকে এখন উঠতে হয়।

ক্লাস আছে কোনো?

না। লাইব্রেরিতে যাব।

পাঁচ মিনিট বাস। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

আনিস তাকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

ড. বায়ার বললেন, শুনলাম তুমি দেশে ফিরে যাচ্ছি। কেমিস্ট্রির চেয়ারম্যানের কাছে এই রকম একটা চিঠি দিয়েছ।

হ্যাঁ।

অবশ্যই এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবু–কারণ জানতে পারি কি? তুমি এক জন ভালো টীচার। এবং হাইলি কোয়ালিফাইড। খুব শিগগিরই টেনিউর পাবে। তারপর গ্রীন কার্ডের জন্যে দরখাস্ত করতে পারবে।

ড. বায়ার, এখানে আমার ভালো লাগছে না।

তোমাকে দোষ দেয়া যাচ্ছে না, এ জায়গার ওয়েদার অত্যন্ত খারাপ। তুমি বরং কালিফোর্নিয়ার দিকে চলে যাও।

ড. বায়ার তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বললেন, দেশটাই তোমার ভালো লাগছে না?

না।

এখানে যে-ফ্রীডম আছে, সে-ফ্রীডম তোমার নিজের দেশে আছে?

না।

এখানকার মতো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা তোমার দেশে আছে?

না, তাও নেই।

দেখ আনিস, আমি অনেক বিদেশীকে দেখেছি, পড়াশোনা শেষ করে দেশে চলে যাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে। চলেও যায়, কিন্তু মাস ছয়েক পর আবার ছুটে আসে। স্বপ্নভঙ্গ বলতে পার।

আনিস কিছু বলল না। ড. বায়ার কফিতে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, তোমরা বিদেশীরা থাক শামুকের মতো। বাইরের কারো সঙ্গে মিশতে পার না। এটা ঠিক নয়। আন্তর্জাতিক হতে চেষ্টা করা উচিত। পৃথিবীটাই হচ্ছে তোমার দেশ। এভাবে ভাবলে আর খারাপ লাগবে না।

আনিস কোনো উত্তর দিল না। ড. বায়ার হড়বড় করে বললেন, তুমি নিশ্চয়ই কিসিং বুথের মেয়ে দুটিকে চুমু খাও নি। খেয়েছ?

না।

এস আমার সঙ্গে, চুমু খাবে। আমাদের কালচারকে দূরে ঠেলে রাখলে তো চলবে না। এস তো দেখি। তবে নীল-স্কার্ট-পরা মেয়েটির থেকে দূরে থাকবে। আমি ঠিক করেছি, ঐ মেয়েটিকে একটি জাম্বো সাইজের এ্যাকোয়াফ্রেশ টুথপেস্ট উপহার দেব, হা হা হা।

আনিসকে ড. বায়ারের সঙ্গে দোতলায় উঠে আসতে হল। কিসিং বুথের নীলস্কার্ট-পরা মেয়েটি নেই। অন্য মেয়েটির গলায় উজ্জ্বল রঙের একটি রুমাল। শঙ্খের মতো সাদা মুখ। শান্ত নীল চোখ। আনিসের মনে হল যেন মালিশা দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দিন মালিশাকে দেখা হয় না। কিসিং বুথের মেয়েটি আনিসের দিকে তাকিয়ে হাসল। হাসিটি পর্যন্ত মালিশার মতো। ড. বায়ার বললেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন, এগিয়ে যাও।

আনিস মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগোল। কাছাকাছি আসতেই চিনতে পারল মেয়েটিকে। তার ছাত্রী। কোর্স নাম্বার পাঁচ শ দুই-তে আছে। মেয়েটি হাত বাড়িয়ে রিণরিণে কণ্ঠে বলল, হ্যালো ডক।

আনিস ঠিক করে ফেলল, একগাদা ফুল নিয়ে আজ সন্ধ্যাতেই আবার যাবে মালিশার খোঁজে। কী ফুল নেওয়া যায়? ডাউনটাউনে ফুলের দোকান কটা পর্যন্ত খোলা থাকে?

১৭. জঙ্গ বাহাদুর

নিশানাথ বাবু সাত সকালে টেলিফোন করেছেন, হ্যালো শফিক, এক কাণ্ড হয়েছে! হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি। কী হয়েছে?

কে যেন একটা গাড়ি কিনে পাঠিয়েছে। নীল রঙের একটা বুইক।

কে পাঠিয়েছে?

কিছুই লেখা নেই।

পরিচিত যারা আছে, তাদের জিজ্ঞেস করেছেন?

পরিচিতরা আমাকে গাড়ি দেবে কেন?

ভুলটুল হয় নি তো? অন্যের গাড়ি ভুলে হয়তো দিয়ে গেছে।

উঁহু। আমার নাম লেখা আছে।

বলেন কি!

তুমি একবার আসবে শফিক? আমি মহা চিন্তায় পড়েছি।

এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি। জং বাহাদুরের কাণ্ডকারখানাও বলব।

নতুন কিছু করেছে নাকি?

হ্যাঁ হ্যাঁ–না শুনলে আপনার বিশ্বাস হবে না। শালা বজ্জাতের হাড্ডি।

তাই নাকি?

গতকালকে ফস করে আমার পকেট থেকে নোটবইটা নিয়ে গেছে। আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে এই রকম ভাব করছে, যেন সে নোট বইটা খেয়ে ফেলবে। বুঝন অবস্থা! বাসায় থাকবেন, আমি আসছি।

তুমি কি এক্ষুণি আসছ?

একটু দেরি হবে। ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ওদের সকালের খাবার দিয়েই আসব। বাসায় থাকবেন আপনি।

ভোর নটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে ড. লুইস শফিককে বললেন জং বাহাদুরকে নিয়ে ল্যাবরেটরি ওয়ানে যেতে। খাঁচা খুলতেই শান্ত ভঙ্গিতে জং বেরিয়ে এল। গুটিসুটি হয়ে বসে রইল শফিকের কোলে। ড. লুইস হেসে বললেন, এটি দেখছি খুব শান্ত স্বভাবের। খাঁচা থেকে

বের করলে এরা খুব চিৎকার করে। ওদের একটা সিক্সথ সেন্স আছে–বুঝতে পারে কিছু একটা হবে।

ড. লুইস জং বাহাদুরের গায়ে দুটি ইনজেকশন করলেন এবং শফিককে বললেন, একে এখন চব্বিশ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। তিন নম্বর খাঁচায় রেখে দাও।

শফিক দেখল জং বাহাদুর ঝিম মেরে গেছে, নড়াচড়া করছে না। খাঁচায় নামিয়ে রাখতেই সে শান্ত ভঙ্গিতে মাঝখানে গিয়ে বসে রইল। শফিক বলল, এই ব্যাটা, কী হয়েছে তোর?

জং বাহাদুর দাঁত বের করল না। জিভ বের করে ভেংচে দিল না। শুধু চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইল।

ড. লুইস, কী দিয়েছেন ওকে?

হেভি মেটাল পয়জনিং করা হয়েছে। রক্তের মধ্যে মারকারির একটা সল্ট ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। ও মারা যাবে ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে। আমরা মেটাল পয়জনিংএর এফেক্ট লক্ষ করব। ব্লাড-প্রেশার কী করে ফল করে, সেটা মনিটার করা হবে।

শফিকের গা কাঁপতে লাগল। তিন নম্বর খাঁচার সামনে গিয়ে ভাঙা গলায় ডাকল, জং বাহাদুর, জং বাহাদুর।

জং বাহাদুর ঘাড় ঘুরিয়ে থাকল। কী শান্ত দৃষ্টি!

দু নম্বর খাঁচার সব কটি বানর ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জং বাহাদুরের দিকে। ওরা কি কিছু বুঝতে পারছে? ড. লুইস এসে দেখলেন, পিপুল ডাইলেটেড হতে শুরু করেছে, মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। লোহিত রক্ত-কণিকা ফুসফুস থেকে আর রক্ত নিয়ে যেতে পারছে না।

শফিক ক্লান্ত স্বরে বলল, ড. লুইস, বড্ড খারাপ লাগছে আমার।

শফিকের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। জং বাহাদুর তোকাচ্ছে শফিকের দিকে। শফিক মৃদু স্বরে বলল, লাইলাহা ইল্লা আনতা সোবহানাকা ইন্নি কন্তু মিনায-যোয়ালেমিন।

ড. লুইস অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সেন্টিমেন্টাল ইণ্ডিয়ানস। সিলি সেন্টিমেন্টের জন্যেই ওদের কিছু হয় না। চাইনীজ পোস্ট ডাকটিও চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে আছে শফিকের দিকে। সে অস্পষ্ট স্বরে চাইনীজ ভাষায় কী যেন বলল–নিশ্চয়ই কোনো ইস্টার্ন ফিলোসফি। রাবিশ, এসব সেন্টিমেন্টাল ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে মুশকিল। এরা বড়ো ঝামেলা করে।

শফিক জং বাহাদুরের খাঁচার শিক দু হাতে ধরে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। জৎ বাহাদুর মনে হল এগিয়ে আসছে তার দিকে। শফিক চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

১৮. মিস মালিশা

মিস মালিশা, তোমার কি রাতে ঘুম হয় নি?

নাহ।

স্নায়ু উত্তেজিত হয়েছিল, সে— জন্যে এই হয়েছে। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে কোনো একটা সিডেটিভের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল। ভুলটা আমার।

মালিশা চোখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল এ্যাটর্নির দিকে। অল্পবয়েসী এই ছোকরাকে বেশ লাগছে তার। সে বলল, আমি তোমার নাম ভুলে গেছি। আই এ্যাম সরি।

আমার নাম ডেনিস বেয়ার। তুমি আমাকে বিল ডাকতে পোর।

বিল, একটি বুইক গাড়ি পাঠাবার কথা বলেছিলাম।

পাঠান হয়েছে।

কে পাঠিয়েছে, কি, কিছুই লেখা নেই তো?

না। কিন্তু মিস মালিশা, কাউকে গিফট দেওয়ার প্রধান আনন্দই তো হচ্ছে গিফট পেয়ে সে কেমন খুশি হল তা জানা, ঠিক নয় কি?

মালিশা জবাব দিল না। ডেনিস বেয়ার মিটমিট করে হাসতে লাগল।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

মালিশা বলল, হাসছ কেন?

আজকের ন্যাশনাল ইনকোয়ারারে তোমার ছবি ছাপা হয়েছে। তুমি বিখ্যাত হতে শুরু করেছ।

মালিশা ক্লান্ত স্বরে বলল, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। আজ আমি কোথাও যেতে চাই না।

মিস মালিশা, ডিসট্রিক্ট এ্যাটর্নি অফিসে আজকে এক বার যেতেই হবে। ঘণ্টাখানিকের বেশি লাগবে না, অনেস্ট!

মালিশা জবাব দিল না। ডেনিস বেয়ার একটি সিগারেট ধরিয়ে হাসিমুখে বলল, সেখান থেকে যাব চেস ম্যানহাটনে, কথা দিচ্ছি ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সব কামেলা চুকিয়ে ফেলব।

আজকে না গেলে হয় না?

না, আজকেই যেতে হবে। ডলার একটি চমৎকার জিনিস। পৃথিবীর মধুরতম শব্দের একটি। কিন্তু শব্দটি মধুময় রাখার যন্ত্রণাও কম নয়।

প্রকাণ্ড একটি ফোর-ডোর শেভ্রোলে গাড়ি হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির পেছনের সিটে মধ্যবয়েসী এক জন ভদ্রলোক একটি সামার কোট পরে বসে আছেন। ডেনিস বেয়ার মৃদু স্বরে বলল, ওর নাম জিম। তুমি যখনি বাইরে যাবে, ও ছায়ার মতো থাকবে তোমার সঙ্গে। ও তোমার বডিগার্ড। খুব এফিশিয়েন্ট লোক।

মালিশ ক্লান্ত স্বরে বলল, আমার এসব দরকার ছিল না।

দরকার আছে।

গাড়িতে উঠেই মালিশা বলল, আমার কেন যেন ভালো লাগছে না, কিছুতেই মন বসছে না।

সন্ধ্যাবেলা অপেরা দেখতে চাও?

টিকিট পাওয়া যাবে?

ডলার দিয়ে পৃথিবীর যে-কোনো জিনিস পাওয়া যায়।

তাই কি?

হাঁ। তুমি কী চাও বলবে, আমি ব্যবস্থা করব। ডলারের মতো চমৎকার জিনিস পৃথিবীতে কী আছে?

ডলারের মতো চমৎকার জিনিস পৃথিবীতে নেই, না?

না।

মালিশার মনে হল তার জ্বর আসছে। কিছুই ভালো লাগছে না। গায়ের সঙ্গে গা ঘেঁষে জিম বসে আছে। লোকটি মূর্তির মতো, সমস্ত রাস্তায় এক বার শুধু বলল, চমৎকার ওয়েদার মিস মালিশ।

ডিসট্রিক্ট এ্যাটর্নি অফিসে দু ঘণ্টার মতো লাগল। মালিশাকে তেমন কিছু করতে হল না। শুধু চুপচাপ বসে থাকা। মাঝে মাঝে দু-একটা ফর্মে সই করা। এ্যাটর্নি জেনারেলের সঙ্গেও মিনিট দশেকের কথাবার্তা বলতে হল। দু ঘণ্টা বসে মালিশার প্রচণ্ড মাথা ধরে গেল।

চেস ম্যানহাটনে যাবার পথে ডেনিস বেয়ার শান্ত স্বরে বলল, মিস মালিশা, আমি বুঝতে পারছি তোমার খুব বিরক্তি লাগছে। কিন্তু উপায় নেই।

চেস ম্যানহাটনে আজ না গেলে হয় না?

না। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

মালিশ চুপ করে গেল। জিম বলল, চমৎকার ওয়েদার, তাই না মিস্টার বেয়ার?

ডেনিস বেয়ার সে-কথার জবাব না দিয়ে মালিশার দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বলল, আমার মনে হয়, আই বি এম-এ তোমার যে শেয়ার আছে সেগুলি বিক্রি করে ফেলা উচিত। আই বি এম ফল করতে শুরু করেছে। তুমি কি ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল পড়?

না।

সূচিপত্র

এখন থেকে নিয়মিত পড়বে। আমি এক জন এ্যানালিস্টও ঠিক করে রেখেছি। সে সপ্তাহে এক দিন এসে তোমাকে ওয়াল স্ট্রীটের ব্যাপারগুলি এক্সপ্লেইন করবে। মালিশা শুকনো গলায় বলল, গাড়িটা একটু রাখতে বল, আমার বমি আসছে।

গাড়ি থামাবার আগেই মুখ ভর্তি করে বমি করল মালিশা। আই এ্যাম সরি।

সরি হবার কিছুই নেই।

এখন কি ভালো লাগছে?

নাহ, বড্ড খারাপ লাগছে। প্লীজ, আমাকে হোটেলে নিয়ে চল।

১৯. কী ভয়ংকর সুন্দর

ইন্টারস্টেটে আসামাত্র হাইওয়ে পেট্রল পুলিশ গাড়ি থামাল। ফার্গো মুরহেড এলাকায় তুষারঝড় হবার সম্ভাবনা–প্রচুর বরফ পড়ছে। হাইওয়ে ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে। টম নেমে এল গাড়ি থেকে।

অফিসার, আমাকে যেতেই হবে। এই মেয়েটির বাবা মারা যাচ্ছে–এই সময় মেয়েটির তার বাবার কাছে থাকা দরকার।

রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। অনেক গাড়ি স্কিড করে পথের পাশে পড়ে আছে।

আমি খুব কেয়ারফুল ড্রাইভার। বিশ মাইলের উপর স্পীড তুলব না। প্লীজ, অফিসার, প্লীজ!

তুমি বুঝতে পারছ না, দারুণ রিস্কি ব্যাপার। অফিসার, প্লীজ! এই মেয়েটিকে আমি যে-করেই হোক তার বাবার কাছে নিয়ে যেতে চাই।

গাড়ি চলছে খুব ধীর গতিতে। টম সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করে। স্টিয়ারিং-হুইলের উপর ঝুঁকে আছে। সে এক সময় শান্ত স্বরে বলল, ভালোমতো কম্বল জড়িয়ে নাও রুন। হিটিং কাজ করছে না।

রুনকি পায়ের উপর কম্বল টেনে দিল, কোনো কথা বলল না। টম নিচু ভল্যুমে একটি ক্যাসেট চালু করেছে। রাতের বেলা গাড়ি চালাতে হলে ঘুম তাড়াবার জন্যে এটা করতে হয়। মিষ্টি সুরে পোলকা বাজছে। রুনকি জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। মাইলের পর মাইল ফাঁকা মাঠ। বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে সব। কী ভয়ংকর সুন্দর!

২০. সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক

আনিস এসেছে একা একা!

তুষারপাত হচ্ছে। রাস্তা জনমানবশূন্য! থার্মোমিটারের পারদ নিচে নামতে শুরু করেছে। স্ট্রীট লাইটের আলো অস্পষ্ট হয়ে আসছে। কে জানে তুষারঝড় হবে কিনা। উত্তর দিক থেকে বাতাস দিচ্ছে। লক্ষণ মোটেই ভালো নয়। আনিস এমিলি জোহানের ঘরের কড়া নাড়ল।

এমিলি জোহান, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ? মেমোরিয়াল ইউনিয়নে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

হ্যাঁ, চিনতে পারছি। খুব কম মানুষের সঙ্গে আজকাল আমার দেখা হয়। আমি সবাইকে মনে রাখি।

আমি একটা মেয়ের খোঁজ করছিলাম, মালিশা গিলবার্ট। ওকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

এমিলি জোহান শান্ত স্বরে বললেন, তুমি কি ওর জন্যে গোলাপ ফুল এনেছিলে? ল্যাণ্ডলেডি আমাকে বলেছিল।

আনিস জবাব দিল না। এমিলি জোহান থেমে থেমে বললেন, আমরা আমেরিকানরা খুব অদ্ভুত জাত। যখন কোনো কিছু চাই, মন প্রাণ দিয়ে চাই। যখন সেই জিনিসটি পাওয়া যায় তখন জীবন অর্থহীন হয়ে যায়।

আনিস কিছু বুঝতে পারল না। এমিলি জোহান থেমে থেমে বললেন, মালিশা গিলবার্ট ঘুমের অষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছে। দীর্ঘ বিরতিহীন ঘুম আনিস, তুমি কি আমার ঘরে এসে বসবে? নক্ষত্র নিয়ে আমি একটি চমৎকার কবিতা লিখেছি।

আনিস বেরিয়ে এল। বরফে-বরফে চারদিক ঢাকা পড়ে গেছে। একটি পরাজিত শহর।

তুষারঝড় হবে। নিশ্চয়ই তুষারঝড় হবে।

আনিস পায়ে হেঁটে বাড়ির পথ ধরল। ভূতে-পাওয়া শহরের জনশূন্য পথঘাট। কী অদ্ভুত লাগে হাঁটতে! ব্রডওয়ের কাছে ছাতা মাথায় একটি রোগা মেয়েকে দেখা গেল। সিগারেটের আলোয় তার ক্লান্ত মুখ চোখে ভাসল ক্ষণিকের জন্যে। মেয়েটি ক্ষীণ স্বরে বললে, হ্যালো মিস্টার, কী ন্যাস্টি ওয়েদার।

আনিস জবাব দিল না। মেয়েটি থেমে থেমে বলল, আজ রাতের জন্যে তোমার কোনো ডেটা লাগবে?

নাহ, ধন্যবাদ।

মেয়েটি এগিয়ে এল। তবু মুখের সিগারেট দূরে ছুঁড়ে ফেলে সরু গলায় বলল, তুমি কি আমার জন্যে এক মগ বিয়ার কিনবে? কী দুঃসহ শীত!

এক দিন এই দুঃসহ শীত শেষ হবে। আসবে রোদ-উজ্জ্বল সামার। ছুটি কাটানর জন্য আমেরিকানরা গাড়ি নিয়ে আসবে হাইওয়েতে। মন্টানা, সল্ট লেক, ইয়েলো স্টোন পার্ক। কত কিছু আছে দেখবার। সামারের রাতগুলি এরা বনের ধারে তাঁবু খাটিয়ে কাটাবে। প্রচণ্ড জ্যোৎস্না হবে রাতে। যুবকযুবতীদের বড্ড বনে যেতে ইচ্ছা করবে। *

———–

সবাই গেছে বনের সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক। পাত্র-পাত্রীদের কাউকেই আমি কোনো দিন দেখি নি।